KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল - ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher অসাবর্ত প্রকাশন
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২৪/১ ২৪/২	Year of Publication বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৯ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৯
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

চতুরঙ্গ ॥ হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

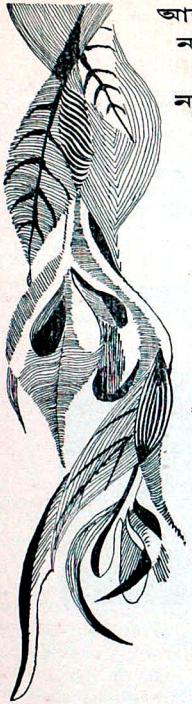

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

॥ সূচীপত্র ॥

হরপ্রসাদ মিত্র ॥ শিল্পীর অবকাশ, স্রষ্টার নিরীক্ষা ৭৭

প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ॥ সেই হাত ৮৫

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ পদাবলীর সূচনা ৮৬

শান্তিকুমার ঘোষ ॥ স্বগতোক্তি ৮৭

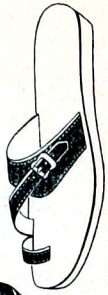

মণিভূষণ ভট্টাচার্য ॥ নৈসর্গিক উপহার ৮৮

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ॥ বিকল্প বসন্ত ৮৯

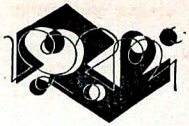

বিমল কর ॥ স্বপ্ন ৯০

অচ্যুত গোস্বামী ॥ বাংলা ছোটগল্পের নবদিগন্ত ৯৭

উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়র ॥ চৈতালী রাতের স্বপ্ন ১০৭

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ যে যেমন সে তেমন ১৪৫

মৃগাঙ্ক রায়। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ॥ আধুনিক সাহিত্য ১৫৫

সমালোচনা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অচ্যুত গোস্বামী, সুধাংশু ঘোষ, নৃপেন্দ্র সান্যাল ১৬৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

চতুর্বিংশতিতম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

চতুরঙ্গ

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

শিল্পীর অবকাশ, স্রষ্টার নিরীক্ষা

হরপ্রসাদ মিত্র

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মঋতুতে নাটকার জে. এম্. সিন্‌জ্ তাঁর ব্যক্তিগত কোনো কোনো বিশ্বাস বা মতামতের কথা লিখে রেখেছিলেন। প্রধানতঃ সে-সব ছিল তাঁর সাহিত্য-বিশ্বাসেরই নানা দিক। তাঁর সেই উক্তিমালার একটিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, যথার্থ শিল্পী যাঁরা, তাঁরা কেবলমাত্র মতবাদের রাজ্যে বাঁধা থাকতে পারেন না। তিনি 'থিওরি' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। কোনো 'থিওরি'তে আবদ্ধ থাকার মানে তো আর-কিছু নয়,—সেই বিশেষ বুদ্ধিতেই বন্দী থাকা! সে অবস্থা শিল্পীর কাম্য নয়। সেটা শিল্পীর স্বক্ষেত্রই নয়। লেখক, চিত্রকর, মূর্তিকার ইত্যাদি শিল্পলোকের সাধক যাঁরা,—তাঁদের বাস অন্যত্র। সিন্‌জের নিজস্ব মত এই ছিল যে, সৃষ্টিক্ষমতা শিল্পিমনের অর্ধ-অবচেতনাতেই নিহিত থাকে। তাঁর কথায়, 'All theorizing is bad for the artist, because it makes him live in the intelligence instead of in the half-subconscious faculties by which all real creation is performed.'

এ কথা এতো বেশি সত্য যে, এ প্রসঙ্গের উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। সাহিত্যের সংসারে, 'থিওরি'-র বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে চলার অন্ত নেই তবু। একথাও ঠিক যে, সাহিত্যের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু সামাজিক জগতে নিত্যই হৈ হৈ লেগে আছে। আজ এক সমস্যা, কাল আর-এক। এইভাবে মানুষের কর্মজীবনে নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত চলছেই। বিচারবুদ্ধির বলে সেইসব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পথ রচনা করাই হচ্ছে প্রতিদিনের ব্যবহারিকতায় অভ্যস্ত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাজ। যাঁরা শিল্পস্রষ্টা, তাঁরাও সেই একই জগতের অধিবাসী। সমাজের মধ্যে বাস করে সামাজিক শিষ্টাচার তাঁরাও মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু তাঁদের ভেতরকার নিগূঢ় শিল্পিসত্তার পুষ্টি নির্ভর করে বেশ কিছু পরিমাণে নির্জনতা উপলব্ধির সামর্থ্যে। সিন্‌জের 'অর্ধ-অবচেতনা' কথাটার ইঙ্গিত সেই দিকেই। বিচারবুদ্ধিলব্ধ 'থিওরি'-সর্বস্বতা নয়,—চাই গহন মনন!

কোনো কোনো পর্বে কোনো কোনো লেখক বা লেখকদল যে সজ্ঞান মনের নিচুতলার অন্যান্য স্তরের ওপর একটু বেশি মাত্রায় জোর দিয়ে মানুষের নানান্ চেতনাস্তর ও স্রষ্টা-

মানসের নিগূঢ় অভিমুখিতা সম্বন্ধে 'থিওরি'র বাড়াবাড়ি না ঘটিয়ে থাকেন, তা নয়। সে-রকম বাড়াবাড়ি নিন্দার যোগ্য। সে বিষয়ে সত্যিকার বড়ো স্রষ্টার কটাক্ষও সুপরিচিত। ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণের "শনিবারের চিঠিতে" প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'অবচেতনার অবদান' লেখাটি এই রকম এক কটাক্ষের নমুনা। তিনি লিখেছিলেন—

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি
লম্বা দাঁড়ার করতাল
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর
লেজখানা যায় ছিঁড়ে
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।

তাঁর এই কবিতার সঙ্গে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে আঁকা 'অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি' নামে একখানি কৌতুকচিত্র ছাপা হয়েছিল। আর, সেই কবিতার মুখবন্ধ হিসেবে তিনি লিখেছিলেন—'অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করাছ। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।'

লেখক-মনের সৃষ্টি-সম্ভাবনার আবশ্যিক শর্ত হিসেবে যাঁরা অবচেতন স্তরের মনন-চিন্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'থিওরি'র বাড়াবাড়ি ঘটাচ্ছিলেন সে-সময়ে,—রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা, এই চিত্র এবং তাঁর এই মন্তব্য তাঁদেরই সমালোচনা।

শশাঙ্কমোহন সেন আরো অনেক দিন আগে লিখে গেছেন—'যেমন সমাজের মধ্যে, তেমনি সাহিত্যের মধ্যেও অনেক শিষ্টাচার আছে, যাহা কদাপি লঙ্ঘন করিতে নাই; এবং লঙ্ঘন অপরিহার্য হইলেও শাস্তিটুকুন মানিয়া লওয়াই কর্তব্য। অস্পষ্টতা, অনির্বচনীয়তা অথবা সংকেতশক্তি যে সংগীত এবং চিত্রশিল্পের একটা পরম গরীয়সী শক্তি, তাহা কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি কোন কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু, কাব্যের মধ্যে, সারস্বত আচারের মধ্যে নানাদিকে উহার সীমা আছে।'

গহন চেতনার উৎস থেকেই যে শিল্পলোকের বড় বড় সৃষ্টির উদ্ভব ঘটে থাকে, সিন্‌জের সেই কথা থেকে এখানে কবিতায় অবচেতন স্তরের বাড়াবাড়ি-ঘটিত দুর্বোধ্যতার কথা উঠলো। এ কেবল আনুষঙ্গিক কথা। এই ধরনেই অন্যদিক থেকে অন্য কথাও হয়তো এইভাবে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে বিষয়বস্তু যাই হোক্ না কেন, বলবার ভঙ্গি বা রীতিটাই যখন প্রধান মনোযোগের বিষয়, তখন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ বা থিওরিতেই বা আপত্তি কিসের? পোপ যেমন 'উইট্' বা বচনচাতুর্যের গুণগান করে লিখেছিলেন—

True wit is nature to advantage dressed;
What oft was thought, but ne'er so well express'd.

কথার চাতুর্যটাই আসল কথা,—এ বিশ্বাসও অনেকের বিশ্বাস। গদ্যে-পদ্যে এরকম কথা বলা হয়েছে। "স্পেক্‌টেটর"-এ একদা অ্যাডিসন লিখেছিলেন—

'Wit and fine writing doth not consist so much in advancing things that

are new, as in giving things that are known, an agreeable turn. It is impossible for us, who live in the latter Ages of the world, to make observations in criticism, morality, or in any art or science, which have not been touched upon by others. We have little else left us, but to represent the common sense of mankind in more strong, more beautiful or more uncommon lights.'

কিন্তু উইট্ অথবা 'ফাইন রাইটিং' সম্বন্ধে এ-কথার সারবত্তা মেনে নিলেও এ যুগে গভীরতর সাহিত্যসৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই নেই—এরকম চূড়ান্ত রায় অভ্রান্ত বলা চলে না। পোপ বা অ্যাডিসনের পরেও ইংরেজি সাহিত্যের ধারায় সৃষ্টির সম্ভাবনা অব্যাহত ছিল।

বাংলায় রবীন্দ্রনাথের যুগে যখন সাহিত্যসৃষ্টির সমস্ত অলিগলি-রাজপথ সবই তাঁর নিজের নানামুখী সামর্থ্যে ভরে উঠেছিল, তখনো তরুণতর নবীন স্রষ্টার পথ বন্ধ হয়নি। ইতিহাসের ধারায় এক কালের সৃষ্টি যখন পরবর্তী কালের বোধে-বিচারে প্রথার অভ্যাস বলে মনে হয়, তখন সেই নবীন আগন্তুককে তাঁর নিজস্ব পথ তৈরি করে নিতে হয়। সে প্রক্রিয়ার মূলে সেই সনাতন সত্যেরই স্বীকৃতি দেখা যায়—চাতুর্যমাত্র নয়, 'থিওরিসর্বস্বতা নয়, কেবল লিপিকৌশল নয়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি "তৃণাঙ্কুর"-এর ভূমিকায় এ-সত্যের ইশারা ছিল। তিনিও সিন্‌জের মতন নিজের উপলব্ধির 'নোট' রেখেছিলেন। এবং অন্যান্য দেশে, অন্যান্য কালে অন্যান্য লেখকদের যা বক্তব্য, বিভূতিভূষণও সেই ধরনের কথা বলে গেছেন—

'লিপিকৌশলের ইচ্ছা ইহাদের মূলে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়িতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোনো বৃক্ষতলে বা শিলাসনে বেসব রচনার উদ্ভব—লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়?...আমার জীবনের ও জগতের বহির্দেশে যাঁহারা অবস্থিত—তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবেন আমি জানি না, তবে একথা অনস্বীকার্য যে কৌতূক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি সকল দর্শকের পক্ষেই স্বাভাবিক—কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানবমনের মূলগত ঐক্য।'

তাঁর সেই "তৃণাঙ্কুর"-এর শেষদিকে কোনো এক বেলেডাঙ্গার পুলের কাছে কোন্ এক ফুলের গন্ধে তাঁর চেতনায় কী আবেশ ঘনিয়ে ছিল, তার উল্লেখ আছে। কুঠীর মঠ থেকে ফেরবার পথে শীতের নিভৃত সন্ধ্যা নেমে আসে। রিগেল বা অন্য কোনো নক্ষত্রের আলো দেখতে দেখতে মন মগ্ন হয়ে যায়। আর সেই অবস্থায় তাঁর মনে হয়—

'যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ রিগেল বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহন গভীর উদাত্ত বাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত ঊর্ধ্বলোকের আয়তনে মনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্তে। ঐ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী—যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এ সত্যটা তাঁদের অজ্ঞাত নয়। এজন্যই এমার্সন বলেছেন, 'Every literary man should embrace solitude as a bride.' এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউওয়ালপোল গত জুলাই মাসের *Adelphi* কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক।' জার্মান মিষ্টিক এক্‌হার্ট কখনো লোকের

ভিড় বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন না—তাঁর 'Our hearts' brotherhood' গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার।'

বিভূতিভূষণ মিস্টিক গাথার নজির তুলেছিলেন বলেই যে সাহিত্যের এই গভীর সত্য এড়িয়ে চলা যাবে, তা কখনোই মানা যায় না। অন্য রকমের মন থেকেও অনুরূপ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। অতঃপর তারও একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে সমারসেট মমের *On A Chinese Screen* বইখানি প্রথম ছাপা হয়। ভূমিকায় তিনি তাঁর ভ্রমণস্বভাবের উল্লেখ করেন। ভ্রমণে মানুষ মাত্রেরই মনে মনে যে স্বাধীনতার অনুভূতি জাগে, সেই অনুভূতির প্রশংসা করে তিনি তাঁর ১৯২০-র চীন-ভ্রমণের কথা-প্রসঙ্গে জানান যে, আহার বা শয্যা এ দুয়ের কোনো দিকেই তাঁর কোনোরকম খুঁৎখুতে ভাব ছিল না। মালয় দ্বীপপুঞ্জের এক দ্বীপে তিন বেলা শুধু রম্ভা-ভোজনেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না, সাভাইয়ের এক দিশিলোকের বাড়িতে মাদুরে শুয়ে রাত কাটাতেও তাঁর কষ্ট হয়নি, আবার চীনের এক নদীতে সারা রাত নৌকোতেও কেটে গেছে! সেই বইখানির চতুর্থ রচনার নাম 'গড়ানে পাথর' (The Rolling Stone)। তাতে যে লোকটির ছবি ফুটেছে, সে এক পশুচিকিৎসকের ছেলে। লণ্ডনের পুলিশ কোর্টের রিপোর্টার হিসেবে সে কিছুদিন কাজ করেছিল। তারপর স্টুয়ার্ডের কাজ নিয়ে যায় বুয়েনোস এয়ার্সে। সেখান থেকে সরে পড়ে সে আরো গিয়েছিল সুদূর গোবি মরুভূমি অঞ্চলে। মম্ তাকে দেখেছিলেন। তার মুখ যেন কোনো এক মাণ্ডু-প্রাসাদের দেয়াল! অতি আবর্জনাময় এক রাস্তার ধারে সেইসব দেয়ালের অন্য পারে চিত্রবিচিত্র আঙিনা আছে,—আছে ড্রাগনের মূর্তি,—আছে আরো কতো কী! বাইরে থেকে তার যেটুকু দেখা যায়, তাতে বিস্ময়কর কিছুই নেই। কিন্তু সেই মাণ্ডু-প্রাসাদের দেয়ালের ভেতরে যেমন নানা রূপ, নানা আঁকিবুকি, সেই লোকটার জীবনেও তেমনি কতো ভ্রমণের স্মৃতি! কতো চিলি, তাহিতি, আময় ঘুরে এসেছে সে! মমের সঙ্গে তার যখন দেখা হয়, এসব ঘটনা তখন থেকে ন'বছর আগেকার কথা। অতঃপর আর একদিন চাকরি শুরু করেছিল সে। কিন্তু কোনো চাকরিতেই টিঁকে থাকা তার ধাত ছিল না। অবশেষে নিজের বিছানা বেঁধে নিয়ে, পাইপ হাতে নিয়ে আবার ভবঘুরেবৃত্তি শুরু করেছিল সে। পায়ে হেঁটে,—কখনো বা গরুর গাড়িতে,—কখনো নৌকোয়—অনেক রাস্তা পেরিয়েছে সে। মোঙ্গোলিয়ার মালভূমিতে, বর্বর তুর্কিস্তানে,—গোবি অঞ্চলে অনেক ঘোরাফেরা শেষ করে সে যখন ক্লান্ত হয়ে পিকিঙে ফেরে, তখন চীনের এক ইংরেজি পত্রিকার তরফ থেকে তাকে কটি প্রবন্ধ লেখবার ফরমাস দেওয়া হয়। লিখে টাকা উপায় করাই তখন তার পক্ষে সবচেয়ে কাম্য, সবচেয়ে সহজ কাজ। মোট চব্বিশটি প্রবন্ধ লিখেছিল সে। কিন্তু—মম্ বলেছেন,—তার সে লেখাগুলি যেন দোকানের সওদার ফিরিস্তি। লোকটি যতোই ঘুরে থাক না কেন, সে সব-কিছুই এলোমেলো ভাবে দেখেছিল। তার দেখবার ক্ষমতাই ছিল না বোধ হয়! মম্ তার স্বভাবের একটু বিশ্লেষণও করে গেছেন সেইসূত্রে। তিনি বলেছেন যে, সভ্য জগতের আচার-আচরণ তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না,—সকলের স্বীকার্য যে পথ, সে-পথ সে পরিহার করে চলে,—জীবন আর জগৎ সম্বন্ধে তার কৌতূহল যদিও কম বলা চলে না, কিন্তু চোখ-কান দিয়ে পাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সে তার আত্মার অভিজ্ঞতা করে তুলতে পারেনি। তার সমস্ত প্রাপ্তিই যেন দেহের অর্জন,—যেন কেবল শরীরেরই অভিজ্ঞতা, 'I think his experiences were merely of the body and were never translated into experiences of the soul. Perhaps that is why at bottom you felt he was common place।' এই ইশারার পরেই তিনি প্রসঙ্গটি আরো একটু বিশদ করে যা বলেছিলেন, সে-মন্তব্য এ-রাজ্যে লাখ কথার মধ্যে এক কথা বলতে আপত্তি হবে না। মমের দেখা সেই ভবঘুরেটির আসলে অন্তর্দৃষ্টিরই অভাব ছিল। এবং—

'That was certainly why with so much to write about he wrote tediously, for in writing the important thing is less richness of material than richness of personality.'

মমের এই উক্তির মধ্যেই সাহিত্যসৃষ্টির আসল শর্তের ইঙ্গিত আছে। আধুনিক জগৎ যে কর্মভারগ্রস্ত, ঘটনাবাহুল্যময় এবং দ্রুতগতি, সে-কথা মানতেই হয়। কিন্তু এই ব্যস্ততার বিবরণ মাত্রকেই সাহিত্যের মর্যাদা দিতে হবে—এরকম কথা কোনো চিন্তাশীল সজ্জনের দাবি হতে পারে না। একথা বিতর্কের বহির্ভূত। তবু যে এ সম্বন্ধে কিছু লিখে জানানো দরকার, তার কারণ, মাঝে-মাঝে সাহিত্যের কোনো কোনো আসর থেকে চেতনাধারার যথাযথ অভিব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজও কথা উঠতে শোনা যায়। বিজ্ঞানমনস্কতা, ইতিহাস-সচেতনতা, সমাজচেতনা, জনকল্যাণ—এমনকি ইন্দ্রিয়কামনার বিশ্লেষণে অতি-মনোযোগও একালের সাহিত্য-সাধনার আবশ্যিক শর্তাবলীর মধ্যে জায়গা দাবি করছে। জীবনের সত্যস্বরূপ উপলব্ধির চেয়ে ধরতাই বুলি ধরবার দিকেই ঝোঁক যেন বেশি দেখা দিচ্ছে। শেষ লক্ষণটি অনেকদিন পরে হলেও পুনরায় প্রাধান্যের প্রয়াসী। ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়ে বাংলায় এ-বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। সে-সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। 'আধুনিকতা'র নামে মানুষের অন্তর্নিহিত 'পশু-ভাব' উদ্ঘাটন করা—অর্থাৎ সেই দিকেই বেশি মন দেওয়া তখনকার 'আধুনিকপন্থী'-দের খেয়াল হয়ে উঠেছিল। এই আধুনিক খেয়ালের সঙ্গে প্রাচীন কালের তুলনা-প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত ঋগ্বেদ, কালিদাসের নামে প্রচলিত 'শৃঙ্গারতিলক', বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্দ্রের কাব্য ইত্যাদি নানা রচনার কথা তুলেছিলেন। তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে—'প্রাচীনেরা শৃঙ্গারবৃত্তিকে দেখিতেন একটা সুস্থ, সুন্দর, প্রফুল্ল, প্রেয়, এমনকি শ্রেয়বৃত্তি রূপে। কিন্তু আধুনিক যুগে জিনিসটাকে যেভাবে দেখান হইয়া থাকে, তাহাতে মনে হয় ইহা যেন একটা দারুণ ব্যাধি।' এ তাঁর নিজের ভাষা। এই আলোচনার মধ্যেই তিনি আরো বলেন যে—'অসল খাঁটি দিগম্বর সত্যের আবরণ আচ্ছাদন অবগুণ্ঠনেরই অন্য নাম সভ্যতা।' এবং একালের বিজ্ঞানমনস্কতার সূত্র ধরে তিনি আরো বলেন—'বিজ্ঞান তাহার রূঢ় আলোক-শলাকা দিয়া আমাদের জ্ঞানের চক্ষু এইভাবে খুলিয়া দিয়াছে; তাই সত্যকে যথাযথ দেখিতে ও দেখাইতে আমাদের ভয় নাই, কুণ্ঠা নাই—সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'।

সত্য-ই কাম্য, অসত্য পরিহার্য। সিন্‌জ্ সেই উদ্দেশ্যেই 'থিয়োরি'র বশ্যতা মানতে চাননি। এও স্বীকার্য যে মানবসংসারে সব যুগে এমন লগ্নও দেখা দেয় না, যখন সহজে বলা যেতে পারে—

'মধুরে, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।'

কিংবা

'যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।'

গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রহসন ইত্যাদি অন্যান্য সাহিত্যপ্রকারের পক্ষে বিবরণের দাম যতোই থাক্, কবিতার ক্ষেত্রে,—আধুনিক দ্রুত, বাস্ত, বিক্ষুব্ধ জগৎ-পরিবেশের প্রকৃতি মেনে নিয়েও বলা চলে যে, মম্ যে বাক্তিত্বের ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন, সিন্জ্ যে অর্ধ-অবচেতন উপলব্ধির ইঙ্গিত করেছিলেন, ইমার্সনের কথা তুলে বিভূতিভূষণ যে নির্জনতাপ্রীতি স্বীকার করেছেন, সেই মনোভঙ্গিই শিল্পীর আবশ্যিক প্রতিষ্ঠাভূমি। পোপের প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জোসেফ ওয়ার্টন দেখিয়েছিলেন যে ডান্ এবং সুইফ্ট্ ছিলেন 'মেন্ অব্ উইট্'; 'যথার্থ কবি' বলতে তিনি ভিন্ন এক শ্রেণীর কথা বুঝিয়ে গেছেন। ম্যাথু আর্নল্ডও প্রায় একই রকম শ্রেণীবিন্যাস মেনে নিয়েছিলেন—'উইট' আর 'সোল' (soul)—এই দুই উৎসের কথা তিনি উল্লেখ করে গেছেন। যথার্থ কবি যিনি, তিনি যে তাঁর আপন কালের সর্বাধিক সজাগ, সর্বাপেক্ষা সচেতন ব্যক্তি, সে-কথা আধুনিক কাব্যতত্ত্বজ্ঞানী রিচার্ড্স্-ও বলতে দ্বিধা করেননি। এইসব আলোচনার মধ্যে 'সচেতনতা' শব্দটির গুঢ়ার্থ অনুভব করে দেখাই একালের বিশেষ কৃত্য। মম্ যে ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছিলেন, কবিতা-সমালোচক এফ. আর. লিভিস আধুনিক কবিতার বিচার-বিধি অনুসন্ধানসূত্রে সেই দিকটিই অন্য শব্দপ্রয়োগের সাহায্যে বুঝিয়েছেন। তিনি 'অভিজ্ঞতার সামর্থ্য' আর 'প্রকাশের ক্ষমতা'—এই দুটি দিকের উল্লেখ করে এ-দুয়ের অবিচ্ছেদ্যতার কথা বলেছেন। বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'রবি-প্রদক্ষিণ' বইখানিতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার ধারায় তাঁর কবিমানসের আলোচনাই যে প্রাধান্য পেয়েছে,—কাব্যরসের আলোচনা যে সে-পরিমাণে জায়গা পায়নি,—এই অনুযোগ জানাতে গিয়ে একটু ঘুরিয়ে সেই বিশেষ সত্যবোধের অভাবের কথাই যেন বলেছিলেন। তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা সম্পর্কিত মতামতের কথা আলাদা। এখানে কেবল পূর্ব-প্রদর্শিত ঐ অনুসন্ধানের কথাই উল্লেখযোগ্য। কবির কল্পনাশক্তির বিশেষ লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর কথা ছিল এই—

'এই বহির্জগৎ—এই সৃষ্টির মধ্যেই যে কল্পনা আপনাকে মুক্তি দিয়া যেন একপ্রকার বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে আত্ম-চেতনা মিলাইয়া সর্ব-বিরোধ ও সর্ব-বৈচিত্র্যের তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতিকেই দ্বন্দ্বাতীত করিয়া তোলে, তাহাই উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা।'

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কবিকর্মে যুগবিভেদগত যে-পার্থক্য তাঁর চোখে পড়েছিল, সেই ব্যবধানের বা যুগবৈষম্যের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেন—"এখনকার কালে কাব্য-রসের আস্বাদনে এইরূপ আত্ম-বিলোপ অতিশয় দুঃসাধ্য, কারণ, তীব্রতর জগৎ-চেতনার ফলে এখন আত্মচেতনাও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে।" কিন্তু, "তথাপি কবিকে কাব্যসৃষ্টি করিতে হইলে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই অন্য উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে; ভাবকে রূপের অধীন করিতে না পারিয়া কেবল রূপকে ভাবের অধীন করিলে চলিবে না...।"

মোহিতলাল নিজে মনে করতেন যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণযৌবনের কাব্যে 'ভাব ও রূপের সাযুজ্য-সাধনে এক অপূর্ব রসের অভিব্যক্তি' ঘটলেও তাঁর সে-পর্বের সাধনা তাঁরই উত্তর জীবনের সাধনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিল। একালের পাঠক-মনোধর্ম সম্বন্ধে তাঁর এ মত উপেক্ষণীয় নয়। তিনি আরো বলেছেন—'আধুনিক কাব্যের কাব্য-সমালোচনায় গীতিকাব্যের আদর্শই অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করায়, কাব্যরস অপেক্ষা কবি-মানসই আলোচনার মুখ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়।' আবার যাঁরা 'সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র অনুসারে' রবীন্দ্র-কাব্যের রস-প্রমাণে যত্নবান হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—'শুধুই রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়,

সকল আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদে তাঁহারা এখনও পরাঙ্মুখ।'[১] এ একালের মনস্তত্ত্ব-প্রধান সমালোচনাভঙ্গিকেও তিনি যেমন অসম্পূর্ণ বলেছেন, অতীতের অলঙ্কার-নির্ণয়-প্রধান ভঙ্গিরও তেমনি নিন্দা করেছেন। এসব পন্থাকে তিনি বলেছেন 'আতিচার'।

তাহলে তাঁর মতে প্রকৃষ্ট পথ কোন্‌টি?—কোন্ রীতি বা দৃককোণ,—আদর্শ বা বিশ্বাস,—বিশ্লেষণ বা বীক্ষার সাহায্যে রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবাহের সম্যক্ মূল্যায়ন সম্ভব? তিনি তো বলেছেন—'যাঁহারা আদি হইতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ কাব্য-সাধনায় তাঁহার কল্পনার নিত্যনব ভঙ্গিকে একই কাব্যব্যক্তির মানস-পরিণতির বিভিন্ন স্তর-বিকাশ মনে করিয়া আশ্বস্ত হন, তাঁহাদের সঙ্গে এই হিসাবে আমার মতবিরোধ নাই যে, সে ক্ষেত্রে কাব্যই মুখ্য নয়, কবিমানসই মুখ্য—সে বিচারের ক্ষেত্রই স্বতন্ত্র। কিন্তু যেখানে কাব্যবিচারই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কাব্যের উপরে কবিকে স্থান দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।'[২]

অর্থাৎ কাব্যবিচারে কবির মনস্তত্ত্বের বিচার গৌণ;—বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ নয়, মতবাদের পর্যালোচনা নয়,—বাইরে থেকে কোনো 'থিওরি'র আরোপও নয়, সন্ধানও নয়;—চাই কবির গহন মননের আস্বাদন! এই ছিল মোহিতলালের অভিপ্রেত আদর্শ।

অতঃপর তাঁর আলোচনা অন্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে। এখানে সে-সব কথা অপ্রাসঙ্গিক। শিল্প-সৃষ্টিতে স্রষ্টার মগ্নতা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য বলতে কী বোঝায়, তার নিদর্শন রসিক পাঠকের অজানা নয়। গল্প, উপন্যাস, মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে সে-সব উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। এখানে সংক্ষেপে দুটি মাত্র দৃশ্যের সাহায্যে ভাষাশিল্পীর সেই মগ্নতার নিদর্শন তুলে দেখানো যেতে পারে। দুটিই অবনীন্দ্রনাথের লেখা। ১৩৩৪ সালে তিনি তাঁর 'আপন কথা'র মধ্যে এইসব ছবি রেখে গেছেন। প্রথম ছবিটি এই—

'এটা জানি তখন—দিন আছে রাত আছে, আর তারা দুজনে এক সঙ্গে আসে না আমাদের তিনতলার ঘরে! এও জেনেছি বাতাস একদিন ঠাণ্ডা, একজন গরম কিন্তু তাদের দুজনের কারো একটা করে ছাতা নেই গোলপাতার—রোদে পোড়ে, বর্ষায় ভেজে ওদের গা।

এও জেনে নিয়েছি যে একটা একটা সময় রোদ অনেকগুলো বাইরে থেকে ঘরে এসেই জালনাগুলোর কাছে একটা একটা মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাতে বসে যায়; কোনোদিন বা রোদ একজন হঠাৎ আসে খোলা জানলা দিয়ে সকালেই—তক্তপোষের কোণে বসে থাকে সে, মানুষ বিছানা ছেড়ে গেলেই তাড়াতাড়ি গড়িয়ে নেয় রোদটা একবার বালিশে তোষকে চাদরে আমার খাটেই—তার পর চট্ করে রোদ বিছানা ছেড়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়ে কড়ি-কাঠে—ধরা পড়ার ভয়ে! হাতের কাছেই আল্‌সের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে জানি আলো হলেই তারা দুজনে পড়া মুখস্থ করে—পাক্ পাখম্, সেজ্‌দী মেজ্‌দী।'

অতঃপর দ্বিতীয় ছবিটি। 'ভাব' নামে ছোটো একটি প্রবন্ধে সেই সময়েই তিনি লিখেছিলেন—

'রূপকথায় শুনেছি—পাতার ঠোঙ্গায় কোন্ এক রাজকন্যার একগাছি চিকণ কেশ—তাই দেখে বিভোর হল ভাবে রাজপুত্র! এটা রূপকথা সুতরাং কথার কথা বলতেও পারো,

[১] মোহিতলালের এই উক্তিগুলি তাঁর "রবি-প্রদক্ষিণ" (পৌষ, ১৩৫৬) গ্রন্থের ১৫—১৭ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া।

[২] "রবি-প্রদক্ষিণ" (১৩৫৬) পৃ. ১৬।

কিন্তু আকাশের প্রান্তে কাজল মেঘের সরু একটি টান—সেটা দেখে যে কবির ভাব জাগে তার কি! শুনেছি চীন দেশে তারা একটা তুলির টান দেখে রস পায়—সাদা কাগজে একটি টান, অন্ধকারে একটি আলোর রেখা—এসব জায়গায় কিনা পরীক্ষা করে দেখলেই পারো!'

একেই বলতে হয় শিল্পীর ব্যক্তিঐশ্বর্যের উদাহরণ। এ কোনো থিওরি-তাড়িত আর্ট নয়। এর মূলে আছে শিল্পীর অবকাশ, আর তাঁর সত্যিকার নিরীক্ষা। সে অবকাশ সক্রিয়তায় পূর্ণ। এর আবেদন সনাতন, তবু এর ভঙ্গি যে সমুচিতভাবে আধুনিক, সে-কথা বলতে আপত্তি হবে কি?

কেবল এই ধরনের ক্ষণচিত্রেই যে শিল্পীর স্বাধীন নিরীক্ষার আনন্দ ব্যক্ত হতে পারে,—শুধু উপমাসৃষ্টি বা রূপকসৃষ্টির মধ্যেই যে এ আনন্দ সীমিত, তাও নয়। সত্যিকার বড়ো সৃষ্টির শর্তই এই। উনিশ শতকের শেষ দশকে—১৮৯১এর ৩রা কার্তিক কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে নদীর ধারে বেড়াতে-বেড়াতে শিলাইদহবাসী রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল—'একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে—জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেইসব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করচে।'

তাঁর সে অবকাশ তো শূন্যতা নয়। সমস্ত চৈতন্য দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, পেয়েওছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—'আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে—সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেণ্ট এবং ঊনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এইরকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব ক'রেচে এবং কত কবি প্রকাশ ক'রতে চেষ্টা ক'রেচে—কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে!'

এই নিরাকুলতা বোধ হয় সমুচিত নিরালাতেই দেখা দিয়ে থাকে। ভাবুকতা ব্যতিরেকে এ লক্ষণ ব্যক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এবং এসব কথা এতোই স্বীকার্য যে, এ-বিষয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

কবিতা

সেই হাত

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

চোখে লেগেছিল আলোর ঝলক পথের প্রান্তে,—
চড়াই পেরিয়ে, উৎরাই ভেঙে, হুড়ু-ধারার
জল ছুঁতে এসে, ক্ষুরধার খাদে বুঝি অজান্তে
সে আমার হাতে রেখেছিল নাকি হাতখানি তার।

পাখির ডানার পালকের মত চিকণ সে হাত
রেশম-কোমল, মনে এই কথা বুনতে বুনতে
যেই পা বাড়াই, উচ্ছল হলো রূপালী প্রপাত;
জলের তরল কণ্ঠের হাসি পেলাম শুনতে।

কে হাসে ওখানে? বিস্মিত মন প্রশ্ন শুধায়—
গেরুয়া-টিলায় রাঙালো গোধূলি-আলোর বাহার;
কেউ হাসেনিতো! শুধু পুলকিত ঘিরে দুজনায়
নিসর্গরাজি তালে তালে যেন দিয়েছে দোঁহার।

পাথরের বুকে পুঞ্জিত যত দুরাশা গভীর,
বিদীর্ণ হয়ে ফেটে পড়ে যেন শতধা-ধারায়;
হৃদয়ে কি সেই জল-কল্লোল আবেগে অধীর
স্নায়ুর তিমিরে মাথা কুটে মরে আঁধার-গুহায়।

ধরা দিয়েছিল সে যেন গহন স্বপ্ন-শিয়রে,
সেই হাত খুলে দিয়েছে দরোজা নীল আকাশের;
কর্মব্যস্ত সংসার মাঝে দিনের প্রহরে
ভোরে উঠে কবে চলে গেছে আমি পাইনিকো টের।

পদাবলীর সূচনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

কেশপাশে বেঁধে রাখো জটিল সময় কুমারিকা!
করতলে করকার কারুকার্য, কম্প্র কর্ণিকায়
কালিন্দীর রাধাচূড়া; প্রতিবিম্বে দোলো কুন্তলিকা।

সজল বাতাসে সিক্ত বসে আছো কলঙ্কছায়ায়।

এই মৃত্তিকার পরে অন্য কিছু কৃষ্য নয় আর
বলরাম বসুদাম দূরে গেছে নবকৃষিকাজে।
এইখানে তুমি আছো, কল্পবৃক্ষ শরীরে তোমার
কাঞ্চন কদম্ব কুম্ভ অকাল আষাঢ়ে ফলিয়াছে।

আর কিছু কৃষ্য নয় নবীন নদীর নীপবনে।
তোমার কোমল কল্ক স্ফুট ক'রে কহ্লারের স্মৃতি
গোপন পুলিনে পুষ্প পদ্মনাল পদাবলী ভণে,
বৈষ্ণব বিনয়পত্রে রৌদ্র লেখে প্রপঞ্চের প্রীতি।

কেশে, মুখচিত্রে যত্নে চর্যা যাও চঞ্চল চন্দনে
অনঙ্গে দংশন করে অনুখন চক্রধর চিতি।

স্বগতোক্তি

শান্তিকুমার ঘোষ

এখন সময় আসে যদি। যখন বিনিদ্র রাতে যন্ত্রণার শেষ প্রান্তে
মনে হয় সব ব্যর্থ; দেবতারা বুঝি মৃত, শার্সির কিনারে দেখি
নিষ্কম্প উদাস মূর্তি, নিষ্পলক দুই চোখে কঠিন আহ্বান
জ্বলে : দ্বিধাহীন যাবো নাকি তখনি সমস্ত ফেলে
জ্যোৎস্নার ধূ ধূ মরু বিশাল চত্বরে। আমার রিক্ততা যত
সঞ্চিত ক্রন্দনরাশি মুহূর্তে উচ্ছ্রিত হবে আর্তেজিয় উৎস মেঘ-চন্দ্রাতপ তলে।
নিরাবেগ তার মুখ, উত্তরবিহীন ঠোঁটে
প্রতিহত হ'য়ে ফেরে একে একে প্রশ্নগুলি। নিজেরই অজান্তে যেন
কখন নিঃশেষ-শক্তি আপনাকে স'পে দিই হিম আলিঙ্গনে।
জ্যোৎস্নায় দীপ্ত বালি :
অনুগামী দেখি আমি ছায়া পড়ে নাকো তবু আমার নায়ক চলে
অমোঘ মসৃণ গতি শূন্যের গভীরে।

নৈসর্গিক উপহার

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

কয়েকটি স্তবক আমি দিতে পারি তোমার দুহাতে।
ফুল নয়, স্বেদ রক্ত সংহারের বৈষয়িক স্তব;
তুমি যদি ফিরে চাও যদি তব নম্র নেত্রপাতে
ব্যবধান ঘুচে যায় কখনো মানবো না পরাভব।
কারণ তোমার বুকে যাহা কিছু তুলে দিতে পারি
সে তোমারই শরীরের পল্লবিত বকুলের ভার,
আমি তারই পাদদেশে লাবণ্যের হন্তারক, নারী;
কে কার শয়নকক্ষে দিতে চায় প্রবেশাধিকার।

নয়ন ফেরাও তব, তাৎক্ষণিক নয়নাভিরাম
দৃষ্টিপাতে ফিরে পাবো আশ্বিনের জলভরা নদী,
বাতাস তোমার কণ্ঠে করতালি দেয় অবিরাম
আলোর প্লাবনে ভাসে কক্ষ, আলো উদ্যান অবধি।
কয়েকটি স্তবক আমি দিতে পারি রৌদ্ররিক্ত দিনে,
প্রতিধ্বনি ফিরে যায়, প্রতিধ্বনিবিহীন আশ্বিনে।

বিকল্প বসন্ত

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

পদে পদে বিপর্যয়, পর্যুদস্ত জীবনের ডালে
পাতা নেই, বৈণবিক পাখীরা বসে না। তবু কাক
কোকিলের ভূমিকায় যতক্ষণ পারুক চেঁচাক;
নৈরাশ্যের অলঙ্কারে যৌবনের প্রতিমা সাজালে
ক্ষতি নেই। উঞ্ছতৃপ্ত হৃদয়ের সেইটুকু ঢের—
ট্রামে বাসে অকস্মাৎ আড়চোখে পাই যদি টের।

এখন বিকল্প প্রেম—বিপন্ন প্রৌঢ়ের ভালবাসা,
আর্থিক দক্ষিণা দিলে মাসে মধ্যে দু'এক সপ্তাহ
ও পাড়ায় রাত্রিবাস, ফুলশয্যা, গন্ধর্ববিবাহ,—
দম নিতে শুশুকের কিছুক্ষণ পরপর ভাসা।
বন্ধুদের কণ্ঠে তবু শরিকের চেনা আর্তনাদ,
কৃষ্ণপক্ষে জন্ম যার চোখ খুলে সে পায়নি চাঁদ।

এখানে বসন্ত নেই—বাদামী আলোর ফিকে ঋতু,
সৌরভের পুঁজিপতি বহুদিন হয়েছে ফেরার
হৃদয় গুটিয়ে নিয়ে হিমহিম জমাট অসাড়
নিরুত্তাপ শামুকের খোলসের অন্তরালে ভীতু।
শিখীপুচ্ছে দাঁড়কাক মেঘ দেখে পাঁচিলে পাঁচিলে
নৃত্যপরা বৃহন্নলা; সূর্য নেই তারার মিছিলে।

স্বপ্ন

বিমল কর

আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখি।

কাল রাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আরও দেখতে ইচ্ছে করছিল; ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যাবার পর অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকলাম, ছিন্নস্বপ্ন আর জোড়া লাগল না।

ঘরে তখন খাবলা খাবলা রোদ এসেছে। ভাড়াটে বাড়িটা নানা কলরবে পূর্ণ। ছেঁড়া স্বপ্নটা জুড়তে না পারার বিমর্ষতা নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম।

বাসি ঘর, বাসি বিছানা; কদাকার লাগছিল। বাইরে আসতে দেখলাম, সত্যবাবু থলি হাতে বাজারে যাচ্ছেন; কলতলায় বালতি টানাটানি হচ্ছে। কয়েক দণ্ড পরেই যমুনাঝি দুধের বোতল নিয়ে বাড়ি ঢুকল। সদরে পা দিয়েই সে গলা ছেড়ে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল, এই মাত্র যেন কাদের বাড়ির ছেলে বাজারের কাছে লরি চাপা পড়েছে। আহা...!

অমন স্বপ্নটা এখন আর কেউ আমায় মনে করতে দিতে চায় না। রটিংপেপার দিয়ে মানুষ যেমন করে কাঁচা কালি শুষে নেয়, এই খটখটে সকাল এবং রুক্ষ সংসার তেমনি করে আমার স্বপ্নের ভেজা ভেজা দাগগুলো মন থেকে শুষে নিতে চাইছিল; আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছিল, আমি স্বপ্ন থেকে যোজন-দূরে রয়েছি। মিনতি বলল, তাড়াতাড়ি বাজারে যাও, ফিরতি পথে লন্ড্রি থেকে কাপড় জামা নিয়ে এস। কাগজ পড়তে পড়তে দাদা বলল, খবর দেখেছিস একটা মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে বাথরুমে ফেলে রেখেছিল। মা বলল, তোর মামার কাছে আজ একবার যাস—বাঁচে কি না বাঁচে ভগবান জানেন। এর পরই আমি সদরে আসতে পাড়ার ছেলেরা চাঁদা চাইতে এল।

স্বপ্নটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল। মরে যাচ্ছিল এক রকম। আমি বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম। সারা সকাল আমায় মরণ-বাঁচনের লড়াই লড়তে হল যেন।

দুপুরে অফিস। ফিতে বাঁধা দুটো ফাইল এগিয়ে দিয়ে দত্তবাবু বললেন, ক্লিয়ার করে দাও হে, আর্জেন্ট; একটা সামারি দিয়ে দিও, সাহেব ফাইল নিয়ে টুরে যাবে।

স্বপ্নটা দুপুরে হারিয়ে গেল।

বিকেলে অফিস-ছুটির পর আমার খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, একটা সুন্দর পাখি যেন হঠাৎ এসে পড়েছিল, আমি খাঁচায় ধরে রেখেছিলাম, সেই পাখি শেষ পর্যন্ত উড়ে পালিয়ে গেছে, খাঁচাটা পড়ে আছে। বিষণ্ণচিত্তে এই শূন্যতা আমি দেখছিলাম, অনুভব করছিলাম।

সন্ধেবেলায় পথের একটা দোকানে চা খেতে গিয়ে হঠাৎ পুরো স্বপ্নটাই আমার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে যাবার পর আমি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চায়ের দোকানের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওই দেওয়ালে একটুকরো রঙ করা টিন আঁটা ছিল; হলুদ রঙের টিন, তার গায়ে গাঢ় লাল হরফে খাবারের নাম লেখা ছিল : টোস্ট ওমলেট ভেজিটেবল চপ চিঙড়ির কাটলেট ইত্যাদি। পাশে পাশে দাম লেখা।

কাল রাত্রে দেখা স্বপ্নটার কথা আমার মনে পড়ল।

স্বপ্নটা শুরু হয়েছিল রেলগাড়ির কামরায়। কোথায় যেন যাব বলে বেরিয়ে ট্রেনে উঠেছি। গাড়ি চলছিল। এক ভদ্রলোক ও-পাশের বেঞ্চে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়ে-ছিলেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, পাশ ফিরে থাকায় আমি ও'র মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম। জনৈকা মহিলা ও'র পাশে কোল পেতে বসে। মহিলার মুখ দেখা যাচ্ছিল। বয়স্কা। মাথার তলায় অগুছোলো ঘোমটা জড় হয়ে আছে। বসে বসে তিনি ঢুলছিলেন। সময়টা রাত। বাইরে অন্ধকার। এঞ্জিনের মুখ থেকে উড়ন্ত অঙ্গারকণা বাতাসে স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল। কখনও কখনও মনে হচ্ছিল আমরা জোনাকির বন পাশে রেখে দ্রুত চলে যাচ্ছি।

কামরায় তেমন আলো নেই। বেতের মস্ত একটা টুকরি, জলের পাত্র আর বেহালার একটা বাক্স ছাড়া আমার কিছু চোখে পড়ছিল না। বেহালার বাক্সটা দেখে অনুমান হচ্ছিল, ভদ্রলোক সঙ্গীতের চর্চা করেন।

আমার পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। গা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ মহিলা ও-পাশ থেকে উঠে এ-পাশে এসে বসলেন। এ-পাশের বাতি জ্বলছিল না। অন্ধকার। আমি সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসলাম। অন্ধকারে উনি যেন বিরক্তির শব্দ করলেন।

সহসা আমার দু পাশে রেল ইয়ার্ডের বাতিগুলো মুখ বাড়িয়ে দিল। জানলা দিয়ে দেখলাম, একটা মাঝারি স্টেশন। বিয়ে বাড়ির শেষ রাতের মণ্ডপের মতন প্লাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। নাম দেখার আগেই স্টেশন ছাড়িয়ে গাড়ি চলে গেল, বাতিগুলো থেমে থাকল, আমরা অন্ধকারে এগিয়ে গেলাম।

মহিলা ডাকলেন।

আমি চমকে উঠেছিলাম। কেমন করে যেন মলিন আলোর ঈষৎ রেখা তাঁর মুখে পড়েছে। আগে ও'কে বেশ বয়স্কা রমণী মনে হয়েছিল, এখন মনে হল, অতটা নয়। মুখের গড়ন ভরন্ত। সামান্য কয়েকটা দাগ ধরেছে কপালে। উনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

—এটা কোন স্টেশন পেরোলো? উনি জিজ্ঞেস করলেন।

—দেখতে পাই নি।

—গাড়িটা বড় জোরে যাচ্ছে, না—?

—হ্যাঁ; মেল ট্রেনের মতন।

—এবার কোন স্টেশন আসবে?

আমি ভাবলাম। কোন স্টেশন আসবে আমি জানতাম না, তবু ভাববার চেষ্টা করলাম।

—আপনি কোথায় যাবেন? মহিলা শুধোলেন।

'আমি কোথায় যাব' এই প্রশ্নে আমি সচকিত হলাম। কোথায় যাচ্ছি ভাবতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমি অন্ধকারে পড়ে আছি; কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

তবে এ-গাড়িতে কেন? কখন এলাম, কেন এলাম? আমার কিছু মনে পড়ল না। পকেট হাতড়ে টিকিটটা খুঁজতে যাব—মহিলা অ্যালার্ম-চেন ধরে টেনে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে ভয় সঞ্চারিত হল, বিদ্যুতের মতন।

'কি করছেন, কি করছেন আপনি—' এই কথা দুটো বলবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি কিছু বলতে পারলাম না, এবং ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসতে লাগল।

ঘুমন্ত ভদ্রলোক জেগে উঠলেন। মহিলা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলছিলেন। হয়ত চোর ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। ততক্ষণে গাড়ি থেমে এসেছিল, আর আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন

হয়ে দরজা খুলে অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম।

তারপর সকাল। সকাল।

সকালে আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত। পাহাড়তলির জমি দিয়ে হাঁটছি। অথচ এটা ঠিক পাহাড়তলি নয়। বড় বড় মাঠ, ঢালু প্রান্তর এবং বিক্ষিপ্ত গাছ ও ঝোপ দেখতে পাচ্ছিলাম। কাছাকাছি কোথাও যেন কাঠ চেরা চলছিল, করাতের শব্দ আসছে, ধাক্কিক শব্দ। কচিৎ পাখি ডাকছিল।

আমার ক্লান্তি লাগছিল। পা ধরে গেছে। চোখ জ্বালা করছিল। বুকে সামান্য হাঁপ ধরেছে।

জায়গাটা নির্জন। সামনে ফসলের ছোট ক্ষেত; সবজি বুনেছে কেউ। লাটাখাম্বায় জল তুলছে কে যেন। চিকন স্বরের একটি করুণ শব্দ ভাসছিল।

হাঁটতে হাঁটতে ঢালু দিয়ে অনেকটা নেমে এসেছি। সামনে ছোট সাঁকো, শুকনো বালির একফালি রাস্তা চকচক করছিল। গাছতলায় একটা গরুরগাড়ি দাঁড় করানো, মাটির হাঁড়ি কলসিতে বোঝাই, গরু দুটো মাঠে চরছে।

সাঁকো পেরিয়ে, বালির রাস্তা ধরে অল্প একটু এগিয়ে আসতেই সেই বাড়িটা আমার চোখে পড়ল। বাড়িটা যেন কোথায় দেখেছি, অবিকল একই ছবি। টালির চাল, পোড়ামাটির মতন রঙ। বাড়ির গায়ে এক টুকরো বাগান; কাঁটালতার বেড়া। কাঠের ফটক। কিছু তরুলতা কিছু ফুলপাতা। লম্বা বারান্দা আমার দিকে মুখ করে যেন চেয়ে আছে। অনেক সময়, আমি দেখেছি, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে আমার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বাড়িটার দরজা জানলা দেওয়াল সব যেন ঠিক ওই রকম করে তাকায়।

এরপর, কী আশ্চর্য, আমি দেখলাম, সেই সুন্দর ছবির মতন বাড়িটার ফটক খুলে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। বারান্দায় চৌকো টেবিল পাতা। চেয়ার সাজানো। হাত কয়েক তফাতে আরও একটা টেবিল, ওই রকম চৌকো, পাশে পাশে চেয়ার। কাঠের জাফরি দিয়ে ছায়া এবং আলোর ফিতে এসে ও-দিকটা কেমন নিবিড় করে রেখেছে।

পথশ্রমে আমার ক্লান্তি এসেছিল; পায়ের পাতা জ্বালা করছে, গোড়ালি দুটো যেন ব্যথায় ডুবোনো। তৃষ্ণা অনুভব করছিলাম, এবং ক্ষুধাও।

বাড়িটার পরিচ্ছন্নতা, শান্তি অথবা নির্জনতা অনুভব করার পর এখানে দু দণ্ড বসবার বাসনা আমায় কাতর করল।

আমি বসলাম। বসার পর চোখে পড়ল কাঠের জাফরির একপাশে একটি ময়ূর। ঘুমিয়ে রয়েছে।

অল্পক্ষণ আমি নীরবে নিশ্চিন্তে বসে থাকলাম। প্রচুর ক্লান্তির পর এই বিরাম আমার ভাল লাগছিল। এত শান্ত আবহাওয়ায় ঘুম আসে। ঈষৎ আচ্ছন্নতা চোখের পাতা ভারী করে তুলছিল।

হঠাৎ ও-পাশের কোনো কোণের ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে স্লেট। মনে হল, মেয়েটি যেন ঘরে বসে পড়ছিল লিখছিল, আচমকা উঠে এসেছে।

আমায় দেখতে পেয়েছিল। ভ্রূক্ষেপ করল না। ময়ূরের পাশে গিয়ে বসল। তার গায়ে ঘন রঙের ফ্রক; মাথার চুল টান করে বাঁধা, কাঁধ পর্যন্ত চুল। ময়ূরটাকে সে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল, ময়ূর জাগল না।

মেয়েটি চঞ্চল। ময়ূর জাগছে না দেখে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

ওর মুখটি আমি দেখলাম। পানপাতার মতন গড়ন। চোখ দুটিতে প্রতিমার সৌন্দর্য। চিবুক সুডৌল। ছোট ছোট দাঁত মুক্তোর দানার মতন দেখাচ্ছিল।

—তোমার নাম কি? আমি তার সঙ্গে আলাপ করবার মতন করে বললাম।

ও আমায় বড় বড় চোখ করে দু পলক দেখল। যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমি তার নাম জানি না।

—কি নাম? ও বলল।—আমার দুটো তিনটে নাম আছে।

—নাকি, দু তিনটে!...একটাই বল, ডাক নামটা।

—পরী।

—বা, চমৎকার নাম। খুব সুন্দর।

—তোমার নাম কি? পরী টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল।

—আমার নামটা তোমার মতন ভাল না। মস্ত বড়, বিশ্রী নাম...

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে।

পরী যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দূরবর্তী সেই স্থান অনুমান করার চেষ্টা করল।

—আমায় একটু জল খাওয়াবে?

পরী সঙ্গে সঙ্গে একপাশে মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ করল। তার পরই চপল পায়ে চলে গেল জল আনতে। হাতের স্লেটটা তার হাতেই।

এখানকার সব কিছুই বেশ অদ্ভুত লাগছিল। এতক্ষণ বসে আছি কোনো বয়স্ক লোকের সাড়া পেলাম না। আমি যে অনধিকার প্রবেশ করেছি কেউ দেখতে এল না। স্বভাবতই আমার মনে হচ্ছিল, এ-বাড়িতে প্রাণীর সংখ্যা অল্প, এবং তারাও অন্দরমহলের এমন দূরবর্তী অংশে থাকে যেখান থেকে সহজে আসা যায় না।

যে কোনো মানুষ এ-বাড়িতে অতি সহজে প্রবেশ করতে পারে। কোনো বাধা নেই। কোথাও বিঘ্ন দেখছি না। আশ্চর্য! আরও অবাক লাগছিল, অনধিকার প্রবেশ করেও আমার খুব একটা অস্বস্তি অথবা সংকোচ হচ্ছে না।

পরী জল নিয়ে এল। তার বাঁ হাতে স্লেটটা আগের মত ঝুলছে। গ্লাসের সবটুকু জল খেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম। পরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার জল খাওয়া দেখল।

—তুমি বুঝি পড়ছিলে? পরীকে শুধোলাম।

—না। পরী অবাক।

—তবে হাতে স্লেট যে...!

পরী তার টানা টানা টলটলে চোখে আমার দিকে এমন করে তাকাল যে মনে হল, আমার কথা শুনে সে আকাশ থেকে পড়েছে। চোখের ফুরফুরে পাতা ফেলল পরী, ঠোঁট ছড়িয়ে এমন করে মুখটা হাঁ করল, যেন বলতে গেল : এ মা, তুমি কিছু জানো না!

আমি জানতাম না। পরীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পরী হাতের স্লেটটা আমার টেবিলে রেখে দিল।

—তুমি কিছু খাবে না? পরী জিজ্ঞেস করল।

—খাব না আবার। খুব খিদে পেয়েছে। এখানে দোকান কই?

—আমাদের বাড়িতে খাবার আছে। পরী তার স্লেট উলটে আমায় আঙুল দিয়ে

দেখাল।—এই দেখ না, কত খাবার। বলতে বলতে পরী দেখল ঘুমন্ত ময়ূরেটা জেগে উঠে জাফরির পাশ দিয়ে ওদিকের বারান্দা হয়ে মাঠে নেমে গেল। পরী চঞ্চল হয়ে উঠল, খুব ব্যস্ত; যেন তার আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই। বলল,—তুমি কি খাবে ঠিক করো, আমি আসছি।

কথাটা কোনো রকমে বলেই পরী তার ময়ূরের পিছু পিছু ছুটে চলে গেল।

পরীকে আর দেখা গেল না। আমার মজা লাগছিল, হাসি পাচ্ছিল। তার ছেলে-মানুষি সারল্য এবং চঞ্চলতা যেন স্নিগ্ধ গন্ধের মতন আমার স্নায়ু পরিতৃপ্ত করছিল।

স্লেটটা দেখলাম। আঁকাবাঁকা অক্ষর, সাদা দাগ কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট। যেন হাতে হাতে মুছে গেছে।

খাদ্যবস্তুর নাম দেখতে গিয়ে প্রথমটায় বুঝি একটি দুটি নামে তেমন মনোযোগ দিই নি, অন্যমনস্ক থাকার দরুণ বোধ হয়, তারপর আচমকা মনোযোগ পড়ল, আমি সকৌতুক কৌতূহলে খাদ্য তালিকা দেখতে লাগলাম, প্রথম থেকেই!

প্রথমটা 'সুখ'। একটু অস্পষ্ট হয়ে আসা সত্ত্বেও স্লেট পেন্সিলের লেখাটা পড়া গেল। 'সুখ' নামক খাদ্যবস্তুটির দাম মাত্র ছ' পয়সা।

পরীকে আমি প্রশংসা করলাম। এ-রকম নাম আমি দেখি নি। কল্পনা করাও অসম্ভব, একটি খাবারের নাম 'সুখ' হতে পারে। আমার হাসি পাচ্ছিল, অশেষ কৌতুক অনুভব করছিলাম।

স্লেটের মসৃণ কালো গায় সাদাটে অক্ষরে একের তলায় অন্য খাবারের নামটিও লেখা। 'সুখ'-এর পর 'তৃপ্তি'; দাম একটু বেশি, সুখের তুলনায়। তবু মাত্র দু আনা। দু আনার 'তৃপ্তি' পছন্দ না হলে আরও দামী খাবার রয়েছে, 'আনন্দ'; চার আনা। আনন্দের পর আরও চার পাঁচটা খাবার। পরীর জামায় লেগে সেই মূল্যবান খাদ্যবস্তুগুলো কেমন মুছে এসেছে, অনেকটা অস্পষ্ট। তবু নজর করে দেখে আমার মনে হল, ওই শেষের দামী খাবারগুলোর একটার নাম 'ভালবাসা', অন্যটা বুঝি 'শান্তি'; এবং শেষেরটা 'ভগবান'।

অনেকক্ষণ এই খাদ্যবস্তুগুলোর নাম দেখলাম। সমস্তটাই ছেলেমানুষি। তবু ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল, কারণ আমি এমন আশ্চর্য দোকানে আর কখনও যাই নি, খাবারের এমন অদ্ভুত নাম আর দেখি নি।

পরী আর ফিরে আসছে না। আমি হালকা এবং স্নিগ্ধ মনে বসে থাকলাম। পরীর অপেক্ষা করছিলাম। জাফরির ছায়া ক্রমশই বারান্দা থেকে দেওয়ালে সরে যাচ্ছিল, দেওয়াল ধরে উঠছিল। একটু বেলায় শীতের রোদ পাওয়া বাতাস মৃদু মৃদু বয়ে গেলে যেমন লাগে এখানে তেমন করে বাতাস বয়ে আসছিল, আমার সর্বাঙ্গ উষ্ণ ও পরিতৃপ্ত হচ্ছিল।

পরী আসছে না। বসে থেকে থেকে আমি উঠলাম; বারান্দা ধরে নীচে মাঠে নেমে গেলাম।

সামনেটা একেবারে ধূ ধূ। তৃণাচ্ছাদিত ঢালু মাঠ। সমস্ত মাঠ উজ্জ্বল ও অফুরন্ত রোদে ডুবে আছে। মাঠের শেষসীমা মেঘের রেখার মতন। তারপর নদী।

পরী ওই মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছিল। তার আনন্দ কোথায়, কি বস্তু নিয়ে সে খেলছিল আমি এত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। পরীকে দেখবার জন্যে, তাকে ডাকতে আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

শুকনো শক্ত মাটির এক ধরনের গন্ধ ও স্পর্শ আছে, রোদে ঘাস এবং অন্যান্য তৃণ

তপ্ত হয়ে এলে তারও এক রকম ঘ্রাণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। হয়ত আমি এই সব প্রাকৃতিক স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করে খুশী হচ্ছিলাম। হালকা লাগছিল। 'পরী'কে ডাকতে গিয়ে দেখলাম আমার স্বর বাতাসে চতুর্দিকে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। পরীর কানে পৌঁছচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত পরীর কাছে পৌঁছতে পারলাম। নদীটা সামনে। ছোট নদী। বালির চরায় অর্ধেকেরও বেশী ঢাকা, ক্ষীণ একটি জলধারা গায়ে গায়ে বয়ে গেছে।

পরীর হাতে স্কিপিং রোপ। সে দাঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুটছিল।

—পরী।

—উঁ। পরী হাঁফাতে হাঁফাতে সামনে এসে দাঁড়াল। রোদে ছুটে ছুটে তার মুখ ঘামে ভিজে গেছে। নাকের ডগা ফোলা।

—আমায় বসিয়ে রেখে তুমি পালিয়ে এলে যে!

—যা রে, আমি কি তোমার কাছে বসে থাকব! পরী ফ্রকের হাতায় মুখ মুছল।

—তোমার স্লেট...

—তুমি খাও নি?

—না। কে খাবার এনে দেবে!

পরী যেন আমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝল না। সেই ভাবে তাকিয়ে থাকল। তারপর তার চোখে কেমন করুণা ফুটল। যেন বলল, তুমি কি বোকা, তুমি ভীষণ বোকা।

স্কিপিংরোপটা মাঠে ফেলে দিয়ে পরী বলল,—চল তোমার খাবার দিয়ে আসি।

পরীর সঙ্গে আমি হেঁটে চললাম। আকাশে বুঝি হালকা এক খণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছিল, তার ছায়া মাঠের বুক দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

—তুমি খাবার চাইলে ও দিয়ে যেত। পরী বলল।

—কে?

—দিদি।

—তোমার দিদিকে কই দেখতে পেলাম না ত।

—পাও নি!...তবে হয়ত কিছু করছে টরছে।

পরী দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছিল। তার পায়ে জুতো নেই। ঘাস আর খড়কুটোয় গোড়ালি ডুবে যাচ্ছে। মাথার চুল এলোমেলো। পিঠের কাছটা আধখানা চাঁদের মতন।

—তোমাদের বাড়িটা খুব সুন্দর। আমি বললাম।—এত সুন্দর বাড়ি আমি দেখি নি।

—এর চেয়েও সুন্দর বাড়ি আছে। পরী বলল।

—কোথায়?

পরী আকাশের দিকে হাত তুলে দেখাল। দেখিয়ে হাঁটতে লাগল।

আমি আকাশটা দেখলাম। হালকা নীচু মেঘটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। রোদের আভায় ফিকে নীল আকাশ গভীর ও অনন্ত দেখাচ্ছিল।

—ওখানে আরও সুন্দর বাড়ি আছে? আমি হাসির গলায় বলবার চেষ্টা করলাম।

—হ্যাঁ।

—কে বলল?

আমি নীরব। মনে হল, কথাটা পরী বিশ্বাস করে। মনে হল, আমিও বিশ্বাস করি।

বাড়িতে পা দিয়ে দেখলাম, বারান্দা তেমনি নির্জন; টেবিল চেয়ার অবিকল সেই

ভাবে পাতা; মনে হয় না আমি যাবার পর অন্য কেউ বারান্দায় এসেছে, একটু চেয়ার নড়িয়ে বসেছে, বা টেবিলের কাপড়ে হাত রেখেছে।

স্লেটটা পড়ে আছে। আমি বসলাম। লেখাগুলো দেখছিলাম। এখন আর হাসি পাচ্ছিল না, কৌতুক অনুভব করছিলাম না। আশ্চর্য, আমি নিতান্ত বালকের মতন বিশ্বাস করছিলাম, এই সব খাদ্য এই বাড়ির অন্দরমহলে কোথাও রাখা রয়েছে। আমার লোভ হচ্ছিল, এবং ক্ষুধার বাসনা তীব্র হয়ে উঠছিল।

পরী বলল,—কই বলো, কি খাবে?

স্লেটের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দাগগুলো আমি কেমন অন্যমনস্ক ভাবে দেখছিলাম। কে জানে, আমি আমার প্রয়োজন ও স্বাদ অনুযায়ী খাদ্যগুলি পছন্দ করছিলাম কি না! বস্তুত আমার পছন্দ করার কিছু ছিল না। এই খাদ্যের কোনোটিই আমার আস্বাদিত নয়। আমি শুনেছি, লোকমুখে বারংবার শুনেছি। আমার লোভ হয়েছে; কাঙালের মতন লোভ করেছি।

—তাড়াতাড়ি বলো। পরী বলল।

কী আশ্চর্য, পরীর কথা কানে গেল কি গেল না, আমার মনে হল আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার সেই তীব্রতায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ফাঁকা মনে হল, যেন ঝিমঝিম করছে, হা হা করছে।

সমস্ত, যা আছে সমস্ত আমি আনতে বললাম। ওই স্লেটে লেখা প্রতিটি খাদ্যই এখন আমার পক্ষে প্রয়োজন। আমি অতীব ক্ষুধার্ত।

পরী চলে গেল। তার স্লেট উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি বসে থাকলাম। জাফরির ছায়াগুলো দেওয়ালে নক্‌শা তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বসে থাকলাম, বসে থাকলাম...বসে বসে ক্লান্ত হলাম। পরী এল না।

কখন বুঝি এ-বাড়ির বারান্দা মেঘলার মতন অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ এল না। কোনো সাড়া নেই। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলে মনে হল বাইরে মাঠ বয়ে হু হু করে বাতাস আসছে।

অনুমান করলাম, বেলা মরে গেছে, বিকেল ফুরিয়েছে, সন্ধ্যা সমাগত। অপেক্ষা করার আর উপায় ছিল না। বিমর্ষ ব্যথিত চিত্তে আমি উঠে আসার কথা ভাবছিলাম। সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলে আমি এই অপরিচিত জায়গায় কোথায় যাব এই ভয় এবং উদ্বেগ আমায় বিচলিত করছিল।

আচমকা মনে হল কে যেন আসছে, বারান্দার অন্ধকার দিয়ে এগিয়ে আসছে। সেই ঘনছায়া জড়ানো, ভীষণ মেঘলার মতন অন্ধকারে আমি তাকিয়ে থাকলাম। আঁধারের প্রতিটি যবনিকা তার আগমনে কাঁপছিল যেন, মনে হচ্ছিল ভীরু মৃগের মতন তার পায়ে শব্দ হচ্ছে। আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

আমি তাকে শেষ অন্ধকারে দেখেছি কি দেখলাম-না, দিনের আলো এসে আমার স্বপ্ন ভেঙে দিল। নিষ্ঠুরের মতন।

তবু, স্বপ্ন ভেঙে যাবার পরও অপেক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ। কেউ এল না।

রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে কালকের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। লক্ষ করলাম, এখানে যারা এসেছে, সকলেই আমার মতন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।

বাংলা ছোটগল্পের নবদিগন্ত

অচ্যুত গোস্বামী

কল্লোল-কালীন লেখকরা যখন এলেন, বাংলাদেশের সাহিত্যের আসর তখন ছোটগল্পের জন্য তৈরী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভাত মুখুজ্জে প্রভৃতির চেষ্টায় ছোটগল্প একটি জনপ্রিয় রচনা-মাধ্যম বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে গল্পের জন্য কিছু স্থান সংরক্ষিত থাকে; এবং উৎসুক পাঠকের দৃষ্টি সকলের আগে সেই পৃষ্ঠাগুলি খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

বাংলাদেশের বন্ধ আবহাওয়ায় কল্লোল-কালীনরা নিয়ে এলেন আর এক ভিন্ন দেশের আবহাওয়া, বাঙালী ফুলের সলাজ সকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশের বদলে বিদেশী ফুলের উজ্জ্বল, প্রখর উগ্র বর্ণবৈচিত্র্য। যে বাঙালী মেয়েরা ঘোমটার আড়াল থেকে মুখখানাকে একটুখানি প্রকাশ করে অসমাপ্ত কথাটাকে হাসি দিয়ে কোন রকমে শেষ করে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিত, সাহিত্যের আসর থেকে তারা বিদায় নিল। তাদের জায়গায় দেখা দিল আর এক জাতের মেয়েরা, যারা প্রসাধন আর পোষাকের পারিপাটো আপন যৌবনকে সরবে বিজ্ঞাপিত করে বিদেশী বইয়ের ভাষায় কথা বলে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াল জীবনের জয় করে নেবে বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে অতখানি বিজয় প্রত্যাশী হয়েও ড্রয়িং রুমের বাইরে তারা পা বাড়াল না। কল্লোল-কালীন সাহিত্যের তাই প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে রইল মেয়ে আর ড্রয়িং রুম।

লেখকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ভাল ছাত্র। তাঁরা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সর্বাধুনিক বই গোগ্রাসে গিলতেন, আর অনায়াসে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে প্রথম হতেন। তাঁরা জানতেন তাঁদের বাঁধা চাকরি আর ভদ্রগোছের মাইনের ভবিষ্যৎ জীবনটা মোটামুটি সুরক্ষিত। কাজেই তাঁদের ব্যর্থতা-বোধ ছিল একটু ভিন্ন জাতের।

অপ্রাপ্যের জন্য কামনা বোধ করি সমস্ত শিল্প-সাহিত্যের পিছনেই উৎস হিসাবে কাজ করে। কিন্তু কোন কোন সময়ে কোন কোন লেখকের মধ্যে এই কামনা অত্যন্ত সরবে উচ্চারিত হয়ে ওঠে। কল্লোল-কালীনরা ছিলেন সেই জাগ্রত সচেতন উচ্চকিত কামনার লেখক। উপমাটা ভাল শোনাবে কিনা জানি না, কিন্তু অগ্নিমুখ পতঙ্গের মতই তাঁরা য়ুরোপীয় সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এদেশের শান্ত স্তিমিত বৈচিত্র্যহীন অনুশাসনপ্রধান পারিবারিক আর সামাজিক জীবনকে তাঁরা মন থেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন (প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো অনেকখানি ভিন্নতর ছিল)। মনে মনে আবাহন জানিয়েছিলেন য়ুরোপীয় সমাজের স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে, তাদের বৈচিত্র্যময়তা আর প্রাণচাঞ্চল্যকে। মেয়ে-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ, যৌন-স্বাধীনতা, বিলাসব্যসন, গতিময়তা, উদ্দাম উৎকট নৈশজীবন, আর সর্বোপরি, বিত্ত যশ আর প্রতিপত্তি লাভের অফুরন্ত সুযোগ,—এই সবই ছিল তাদের অন্তরের একান্ত কামনা। তাঁরা ভাল করেই জানতেন হতভাগ্য বাংলাদেশে জন্মলাভের দুর্ঘটনার দরুণ জীবন-কালের মধ্যে এ-সব কামনা পরিপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবং সেই জন্যই দেখা দিয়েছিল ব্যর্থতা-বোধ। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল

প্রভৃতি লেখকদের প্রথম জীবনে লেখা গল্পে প্রধানতঃ দু' জাতের বিষয়বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হয় কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ, আর নয়তো ব্যর্থতাবোধজনিত রক্ষণশীল সমাজের উপর বেপরোয়া আক্রমণ।

এ-সব হল বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের ইতিহাস। আর আজ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে দেখতে পাচ্ছি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিপুল পট-পরিবর্তন ঘটে গেছে। দ্বিতীয় দশকে যে কামনাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, আজ সেই কামনা নানা তীর্যক পথে চরিতার্থতা খুঁজতে গিয়ে হলাহলে পরিণত হয়েছে। কামনা-বিকৃতির সেই বীভৎস রূপ আজকের লেখকদের দৃষ্টি-পথকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সাম্প্রতিক গল্প-সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তুই তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে কামনা-বিকৃতি বা সামাজিক ব্যাভিচার। প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ, খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল, জনতার জন্য নির্দিষ্ট টাকা আত্মসাৎ করা,—এই সব সমাজ-বিরোধী ঘটনা এখন অনেক গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ এ-সব তো বেপরোয়া কামনারই স্বাভাবিক পরিণাম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি যৌন-কামনার ক্ষেত্রেও আজ নানা বিসর্পিল পথে যৌন-স্বাধীনতা অর্জনের পথ তৈরী হয়েছে। কিন্তু যৌন-স্বাধীনতার সেই ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ দেখে এ-কালের কোন লেখক সতীত্ব আর ব্রহ্মচর্য সামাজিক কুসংস্কারমাত্র এ-কথা সদম্ভে ঘোষণা করছেন না কল্লোল-কালীনদের মত।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বা যুদ্ধের সময় থেকে সামাজিক ব্যাভিচার যে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে এমন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর যেটুকু ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নানাবিধ অসৎ উপায়ে সেকালের ধনীরা অর্থ-সংগ্রহ করতেন; এবং সে জন্য চিরগুপ্তের পাপ-পুণ্যের খাতায় কী লেখা হয়েছিল জানা নেই, তবে সমাজের খাতায় তাঁরা গণ্যমান্য বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। আমাদের আপিসের কেরাণীবাবুরা বা থানার দারোগাবাবুরা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ঘুষ কী করে নিতে হয় তার শিক্ষালাভ করেছিল। আর যৌন-স্বাধীনতার কথা বিশেষ করে বলে কী হবে? ঊনিশ শতকের উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষমাত্রেই ও-জিনিসকে স্বাভাবিক দৈনন্দিন অভ্যেসে পরিণত করেছিলেন। আর পুরুষরা যখন ব্যাভিচার করতেন, তখন ব্যাভিচারিণীরাও নিশ্চয়ই ছিলেন; তবে তাদের পক্ষে অনেক সময় সংসারে বাস করা হয়তো সম্ভবপর হয়ে উঠত না। কাজেই বড়জোর বলা চলে যে বৃহত্তর স্বাধীনতার আন্দোলনের চাপে মাঝখানের কয়েকটা বছর আমাদের ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটিকে একটু দাবিয়ে রাখতে হয়েছিল। বৃহত্তর স্বাধীনতাকে পাওয়া গিয়েছে। স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রতরটিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

এ-কথা ঠিক যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে সামাজিক দুর্নীতি বর্ষার হঠাৎ প্লাবনের মতই স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। তার কারণ যুদ্ধের সময় বাজারে কিছু ফাঁপানো টাকা ছিল। আর বর্তমানেও সেই একই অবস্থা উপস্থিত রয়েছে; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির হাঁড়িকে দেশে কিছু ফাঁপানো টাকা আছে। যে বাড়তি টাকা সপ্তে সপ্তে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে সুসমঞ্জসভাবে ছড়িয়ে পড়ে না সেই টাকাটাই কিছু বিপত্তি ঘটাবে এমন আশঙ্কা থাকে। কাজেই inflated economyটা চলে গেলেই দুর্নীতির হঠাৎ প্লাবনটা হ্রাস পাবে এমন আশা করা অন্যায় নয়। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করি শাসন-রজ্জু যদি আরও দৃঢ় হত, তবে বোধহয় এই দুর্নীতির স্রোত এত তীব্র আর অবারিত হয়ে উঠত না। কিন্তু সরকারকে কর্তব্য-সচেতন করার জন্য সাহিত্য ছাড়া আরও অনেক পন্থতি আছে। দুর্নীতিদমন অভিযানে ছোটগল্প একটি দুর্বল হাতিয়ার। তথাপি দুর্নীতি—বিশেষ করে

যৌন-দুর্নীতির—চিত্রায়ন ছোটগল্পে কেন এত প্রাধান্য লাভ করছে? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব না জানলে সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে আমরা তার নাগাল পাব না।

বঙ্কিমের কালে আমাদের নৈতিক চিন্তার মধ্যে কোন সন্দেহের বিন্দুবিসর্গ ছিল না। দুর্নীতি এবং ব্যাভিচারের প্রাচুর্য থাকলেও তার জন্য যাঁরা নীতিবাদী তাঁদের মন বিচলিত হত না। তাঁরা জানতেন যে মানুষের সমাজের নৈতিক বন্ধন একটা অমোঘ নিয়ম। এবং ভগবান-সৃষ্ট-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার সূত্রে মানব-জীবনের একটি সুনির্ধারিত স্থান রয়েছে। কাজেই যারা অন্যায়কারী, ইহলোকে হোক, পরলোকে হোক, জন্মান্তরে হোক, তারা শাস্তি পাবেই। 'পরিত্রাণয় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' ঈশ্বর নিশ্চয়ই যা হোক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কাজেই নীতির পথ যারা অনুসরণ করে চলত তাদের মনে শান্তি ছিল। যাঁরা একটু শক্ত ধাতুর লোক ছিলেন তাঁদের অনেকে stoic-পন্থীদের মত ভাবতেন, ভাল হোক বা না হোক নীতির পথ আমি ছাড়ব না। এক কথায়, সেদিনকার কারও মন এমন কোন চিন্তায় পীড়িত হত না যে নীতির পথ অবলম্বন করে তিনি জীবনে ভুল করেছেন।

তারপর ধীরে ধীরে আমাদের দেশে সহর, যন্ত্র আর বাণিজ্য-কেন্দ্রিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পশ্চিম দেশ থেকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা গ্রহণ করেছি জড়বাদ আর ভোগবাদের দীক্ষা। ঈশ্বর পরলোক প্রভৃতি জিনিসগুলোকে আজকের সামান্য কৃষকও আর তেমনভাবে বিশ্বাস করে না। যারা নিয়মিত মন্দিরে মসজিদে বা গীর্জায় যায় আর পাণ্ডা বা মৌলবী বা পুরোহিতকে নিয়মিত পয়সা দেয় তাদের মনেও আগের দিনের সেই সক্রিয় ধর্মবিশ্বাস নেই। আমরা জেনেছি যে নীতি মানুষের তৈরী, তা ভগবানের নিয়মও নয়, প্রকৃতির নিয়মও নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নীতি। পশ্চিমীদের সমাজ-নীতি অনেক বেশী কামনা-চরিতার্থতার সুযোগ দেয়, তথাপি ঈশ্বরের রোষ তাদের উপর পতিত হয়নি। অবশেষে কল্লোল-কালীনরা এসে ঘোষণা করলেন যে কামনা-চরিতার্থতাই জীবনের সার-কথা, এই ব্যাপারে যে-সমাজ-নীতি সর্বাধিক স্বাধীনতা দেবে সেই নীতিই গ্রহণীয়।

আজকে নিতান্ত অশিক্ষিত মানুষও জানে যে law of life আর law of morality এ দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আমরা যদি জীবনের নিয়মকে আয়ত্ত ও অনুসরণ করতে পারি তবে বিত্ত প্রতিপত্তি সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু নৈতিকতা এ-সবের কিছুই আমাদের দিতে পারবে না। এক কালে মৌকিয়েভ্যালী বলেছিলেন যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ন্যায় বা সততার দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের উন্নতি-বিধানই যখন একমাত্র লক্ষ্য, তখন সেইদিকে নজর রেখে যে কোন কূট-কৌশলকে সমর্থন করা যায়। দেশভক্তির দোহাই দিয়ে গত তিন চারশো বছর ধরে আমরা রাষ্ট্রের অন্যায় নীতিকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়ে এসেছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রেও মৌকিয়েভ্যালীর নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য। জীবন-যুদ্ধে উপযোগিতার প্রশ্নে নৈতিকতা সংশয়াতীতভাবে পরাজিত—অসম্মানিত হয়েছে। এই পরাজিত সৈনিকটির জন্য আমরা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না।

কেন আমরা নৈতিকতাকে অবলম্বন করব? ধর্মের জন্য? কিন্তু আমরা জানি, আমাদের এই একটাই জীবন; জীবনের পরে মৃত্যু এবং পরিসমাপ্তি। সমাজের জন্য?

কিন্তু আমরা জানি জীবনে জয়ী ও সার্থক না হতে পারলে সমাজ আমাদের নৈতিকতাকে এতটুকু মূল্য বা মর্যাদা দেবে না ; এবং জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য দরকার ন্যায়-নীতি-নিরপেক্ষ মেকিয়েভ্যালীর নীতি। ইতিহাসকে সাহায্য করার জন্য? মূর্খতারও একটা সীমা থাকা দরকার! যে ভবিষ্যৎ-কালে আমরা থাকব না, আমাদের কোন চিহ্ন থাকবে না, সেই ভবিষ্যতের অজ্ঞাত মানুষদের সুখের জন্য আমাদের এই অত্যন্ত বাস্তব, একান্ত সত্য, কামনা-জর্জরিত জীবনকে বঞ্চিত করব?

না। নৈতিকতা পরাজিত—অসম্মানিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমরা এ-ও জানি নৈতিক বন্ধন ছাড়া মানুষের সমাজ টিঁকতে পারে না। নীতি মানুষের রচিত, কিন্তু মনুষ্য সমাজও মানুষের সৃষ্টি। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় আমরা মানুষের সমাজকে প্রকৃতির নিয়ম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। প্রকৃতি-সম্মত সমাজ-নীতির প্রবক্তরা যত কথাই বলুন, আজ আর মানুষের সমাজকে প্রকৃতির কাছে সত্যি সত্যি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমাদের জীবন-যাত্রা কৃত্রিম ; এই কৃত্রিমতাকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

কাজেই নৈতিকতা আজকে এক সমাধানাতীত সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্নীতির সঙ্গে আজকের দুর্নীতির তফাৎ এইখানে। বাইরের চেহারায় খুব বেশী তফাৎ নেই, তফাৎ আছে তাৎপর্যে। নৈতিকতার উপযোগিতা সেদিন সন্দেহভাজন ছিল না ; আজকে নৈতিকতাকে আমরা অনায়াসে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অনুপযোগী বলে চিনতে পেরেছি। নৈতিকতাকে অবলম্বন করলে জীবনে সার্থকতা আসবে না। নৈতিকতাকে পরিহার করলে সমাজ বাঁচবে না। এই হল সংক্ষেপে আজকের দিনের সংকটের পরিচয়।

জিনিসটা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন সরোজকুমার রায় চৌধুরী একটি ছোট গল্পে। এক ব্যক্তি ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা চুরি করে বার বছরের জন্য কারাবরণ করে। ফিরে এসে টাকার জোরে সে সহজেই সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠল। মাত্র একজনের কাছে সে নিজেকে ছোট ও হীন বলে মনে করে—তার এক নীতিবাগীশ বাল্যবন্ধুর কাছে, যে তার সমস্ত ইতিহাস জানে। এই হীনতাবোধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে নিজের পুত্রকে বাল্যবন্ধুর কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করে। বাল্যবন্ধু অস্বীকার করে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী যখন বিবাহ-প্রস্তাবটি পুনর্জীবিত করতে চেষ্টা করে, তখন আমাদের হঠাৎ-ধনী ব্যক্তিটি তা অস্বীকার করে। বাল্যবন্ধুর মৃত্যুর পরে এখন আর কারও কাছেই তার কোন নৈতিক দুর্বলতা নেই।

হাল্কা কলমে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে লেখা এই গল্পটি সংকটের গভীরতা ও ভয়াবহতার অনুভূতি জাগতে পারেনি। কিন্তু সংকটের স্বরূপ সঠিকভাবে উপস্থিত করেছে।

গল্প-লেখককে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। পড়া কথা, শোনা কথা, বা খবরের কাগজের রিপোর্ট তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়। শুধু অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, যদি লেখক তার মর্মার্থ পাঠ করতে না পারেন। যদি অভিজ্ঞতা জাড়িত হয়ে সংকটের গভীর উপলব্ধিতে পরিণত না হয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতির খণ্ড খণ্ড চিত্র বিভিন্ন ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অসাধুতা, প্রতারণা, নিপীড়ন প্রভৃতির অজস্র কাহিনী চোখে পড়ে তেমনি যৌন-ঘটিত দুর্নীতিরও অনেক কাহিনী

লিপিবদ্ধ হয়েছে। বরং বলা চলে যৌন-ঘটিত দুর্নীতিই লেখকদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভদ্রঘরের দারিদ্র্য-পীড়িত মেয়েরা ধীরে ধীরে বহুভোগ্যায় পরিণত হতে বাধ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক অধীনতা মেয়েদের যে-সব বিপদের সম্মুখীন করে, কলকাতায় এমন বাড়ি আছে যেখানে কুমারী মেয়ে আর অবিবাহিত পুরুষ সন্ধ্যেবেলা যথেচ্ছ বিহারের জন্য দু' এক ঘণ্টার জন্য ঘরভাড়া নিতে পারে, যারা প্রয়োজন বোধ করে তাদের জন্য কলকাতার হোটেলেও নারী সরবরাহ হয়, নারী সরবরাহ একটা নিয়মিত ব্যবসা,—ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ বিভিন্ন বাংলা গল্পে স্থানলাভ করেছে। এ যুগের ছোটবড় প্রায় সব লেখকই এই ধরনের কোন না কোন প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প লিখেছেন।

অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই যুগ-সংকটের উপলব্ধির গভীরতর প্রকাশ নেই। গল্প-গুলোর মধ্যে সাধারণতা প্রাধান্য লাভ করেছে, বাস্তবতা নয়। সাধারণতার ভিত্তি একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস,—মানুষের ধ্যানধারণা, নীতি-বোধ, কর্ম-পন্থা, সব-কিছু তার পারি-পার্শ্বিকের দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষ এক নিষ্ক্রিয় যন্ত্র ; পরিবেশ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে রূপদান করে। কাজেই যে-নীতির উপর ভিত্তি করে এমিল জোলা তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন, এ গল্পগুলো তার চেয়ে অগ্রসর নয়। এ গল্পগুলির আবেদন তাঁদের কাছে যাঁরা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন। বিশেষত্ব এই যে বাংলা দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী মাঝে মাঝে একজন আদর্শবাদী যুবক এসে সামনে উপস্থিত হয় কোন কোন গল্পে। দুর্নীতির সংজ্ঞা নিয়েও জটিলতার অবকাশ আছে। কল্লোল-যুগের পর বঙ্কিমী রক্ষণশীল নৈতিকতায় আজকের অনেক লেখকেরই আস্থা নেই। কোন নারী যদি চাকরি যাওয়ার ভয়ে উপরস্থ অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে সেটা যে দুর্নীতি তা সহজে বোঝা যায়। কিন্তু কোন নারী যদি স্বামীর দেওয়া জীবন যাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ পরপুরুষকে গ্রহণ করে তবে তাকে কি একবাক্যে দুর্নীতি বলা যায়? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর এবং আরও দু'এক জন এ-ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আবার নরেন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গের নৈতিক সমস্যাটা এড়িয়ে গিয়ে তার মানবিক তাৎপর্যগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে লেখকদের উপলব্ধি কল্লোল-কালের সীমানাকে ছাড়িয়ে আসতে পারছে না।

আমি আগেই বলেছি এ-যুগের সংকট ঠিক তাদের নিয়ে নয় যারা দুর্নীতির কবলস্থ। এ যুগের সংকট প্রকৃতপক্ষে তাদের নিয়ে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, অথচ নৈতিকতার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা-বোধ হারিয়ে ফেলেছে। যারা মনে মনে স্বীকার করে যে তারা নির্বোধ অথবা অক্ষম, অথবা দুই-ই, আর সেইজন্যই সমাজের উপরতলায় ওঠার সিঁড়িটা তারা খুঁজে বের করতে পারেনি। যারা মনে মনে জানে যে তারা সুযোগের অভাবে চরিত্রবান।

এক কথায় অপরাধ না করেও অপরাধ-বোধ এ যুগের সংকটের চরিত্রগত লক্ষণ। কাফ্‌কার The Autocratic Father গল্পের নায়ক যখন জ্ঞাতসারে কোন অপরাধ না করেও নিজেকে নিরপরাধ বা শাস্তির অযোগ্য বলে ভাবতে পারছে না, তখন যুগযন্ত্রণার প্রকৃতি গভীর তাৎপর্য ধরা পড়ে। আঁদ্রে জিদের *Immoralist* প্রথমে খুবই moralist ছিল ; কিন্তু moralist হওয়ার মধ্যে কোন তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে সে ভিন্ন পথ গ্রহণ করল। এখানে আমরা যুগ সংকটের গভীরতার আভাস পাই।

ননী ভৌমিকের রচিত একটি গল্পে এই অপরাধ না করেও অপরাধ-বোধের ইঙ্গিত

ছিল। কামু-রচিত *The Fall* এর আঙ্গিক কৌশলের অনুকরণে তিনি গল্পটি বিবৃত করেননি। ঘটনার পরে নায়কের মনের কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিন্তার মধ্যে ঘটনাটার একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। গল্পটি সঙ্গতভাবেই কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং তারপর থেকে একদল তরুণ লেখক Stream of consciousness নাম দিয়ে একটি নতুন রীতিতে গল্প লিখতে সুরু করেছেন। এই পরীক্ষামূলকতার মধ্যে কয়েকজন সাম্যবাদে বিশ্বাসী তরুণ লেখকও যুক্ত আছেন দেখে বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের জানা উচিত যে গল্পের বিচার গল্পের শেষে লেখক কী বক্তব্য হাজির করলেন তা নিয়ে হয় না; গল্পের বিচার হয় পাঠকের মনে সেটা কী effect বা অনুভূতি সৃষ্টি করছে তা দিয়ে।

চেতনা-স্রোত রূপায়ণের রীতি একটি ভাঙা-চোরা শতধা বিচ্ছিন্ন মনের অনুভূতি জাগ্রত করে; এরকম একটি মন যদি হঠাৎ কোন গভীর বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তো তা সহজেই লেখকের আরোপিত বলে বোঝা যায়। এ-সব লেখকদের বুঝতে পারা উচিত যে এরকম একটা রীতির প্রতি তাঁদের যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ তাঁদের শিল্পী-মানসের উপলব্ধি আর সাম্যবাদের প্রতি অগভীর বিশ্বাস এ দু'য়ের মধ্যে বিরোধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ননী ভৌমিকের গল্পটি আদৌ stream of consciousness—অলস চৈতন্যে যে একের পর এক ছবির মত বিশৃঙ্খল, পারম্পর্যহীন চিন্তার স্রোত ভেসে যায়, এবং তার ভিতর দিয়ে যে ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের মত নির্জ্জান মনের গুপ্ত সত্য উদ্ঘাটিত হয়, তার শৈল্পিক রূপায়ণ নয়। ননী ভৌমিকের গল্পটিতে রয়েছে কতকগুলি অভিজ্ঞতার পরে নায়কের স্বীকারোক্তি। অন্তরঙ্গ জনের কাছে বিবৃত করেছে বলে তার কথাগুলো একটু বিশৃঙ্খল।

"চতুরঙ্গে"র একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত সুধাংশু ঘোষের লেখা একটি বড় গল্পে অপরাধ না করেও অপরাধ-বোধের স্বীকৃতিকে উপজীব্য করা হয়েছে। গল্পটির মধ্যে কামুর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে; না হলে এটিকে এ-যুগের একটি তাৎপর্য-পূর্ণ গল্প বলে উল্লেখ করতে পারতাম।

যুগ-সঙ্কটের গভীরতার উপলব্ধি যে শুধু আত্ম-অপরাধের স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করতে হবে আমি তা বলছি না। লেখক তাঁর উপলব্ধি ও কল্পনা অনুযায়ী নানাভাবে তাকে রূপ দিতে পারেন। একটি বিদেশী গল্পে পড়ছিলাম, একটি ছবি-পাগলা লোক সারা জীবনের রোজগার দিয়ে অনেকগুলো দুর্মূল্য ছবি সংগ্রহ করার পর হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে, জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে; এবং স্ত্রী ও কন্যা অন্য কোন উপায় না দেখতে পেয়ে একে একে দুর্মূল্য ছবিগুলো বিক্রি করে দিতে বাধ্য হল। বৃদ্ধ প্রতিদিন ছবিগুলো নাড়াচাড়া করে এবং তাইতেই তার অপার আনন্দ। কাজেই স্ত্রী ও কন্যা বৃদ্ধকে ঠকানোর জন্য বিক্রিত ছবিগুলোর বদলে অবিকল সেই মাপের শূন্য ফ্রেম রেখে দিল। যখন কোন অতিথি আসে, তখন মা আর মেয়ে তাকে আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে রাখে। বৃদ্ধ যখন এক এক করে শূন্য ফ্রেমগুলো তুলে স্মৃতি থেকে তার অপূর্ব শিল্প-কৌশলের বর্ণনা দেয়, তখন অতিথিও উৎসাহের সঙ্গে তাতে সায় দেয়। এখানে প্রতারণার পেছনে রয়েছে অন্ধ বৃদ্ধের প্রতি সুগভীর মমতা বোধ। তবু কী জঘন্য প্রতারণা!

একটি ইতালীয় গল্পে বিবৃত হয়েছে যে মুসোলিনীর আমলে যে-সব ফ্যাসিস্ত-তন্ত্রের প্রতি উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তাঁরা বহাল তবিয়তে রয়ে

গেলেন; কিন্তু এক ব্যক্তি যে আগাগোড়া মুসোলিনী সম্পর্কে মোহমুক্ত, সে নিতান্ত চাকরির দায়ে ফ্যাসিস্ত্ দলে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছিল বলে শাস্তি লাভ করল। যে মেয়র তাকে আগে ফ্যাসিস্ত্ পার্টির সভ্য হতে বাধ্য করেছিল, সেই মেয়রই তাকে সেই অপরাধের দরুণ চাকরি থেকে বিচ্যুত করল। মেয়রের অবশ্য কোনই ক্ষতি হল না। গল্পটি গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। মানুষের প্রকৃতমূল্য নির্ধারণে নির্বিকার অক্ষমতাই এই যুগকে অন্তঃসারশূন্য করে দিচ্ছে।

এ-সব গল্পের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখা এমন একটি বাংলা গল্প পড়েছিলাম। এক আত্মসুখপরায়ণ ব্যক্তি পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কথা না ভেবে প্রায় সমস্ত রোজগারের টাকা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করেন। সুখ-ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় টাকায় টান পড়ায় তিনি একবার তহবিল তছরূপ করেন এবং ধরা পড়ে জেলে যান। লজ্জায় ঘৃণায় অপমান-বোধে লোকটির স্ত্রী দিশেহারা হয়ে ওঠে; তদুপরি তার সংসারের এখন অচল অবস্থা। জেল থেকে লোকটি স্ত্রীকে ডেকে পাঠান এবং সঙ্গে সিগারেট নিয়ে যেতে বলেন। স্ত্রী দেখা করতে গেলে তিনি প্রথমেই সিগারেটের কথা জিজ্ঞেস করেন এবং সিগারেট আনা হয়নি শুনে রাগে আগুন হয়ে উঠলেন। দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্রের এমন মনস্তত্ত্ব-সম্মত প্রকৃত চিত্র খুব কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্রূপাত্মক এই গল্পটি পড়ে আমরা সত্যিই অনুভব করি যারা দুর্নীতির সাগরে তলিয়ে রয়েছে তাদের মনে একটুও লজ্জা বা বিকার নেই; যারা সেই সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে তারা লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না।

সাম্প্রতিক তরুণ লেখকদের কলম থেকে এরকমের তাৎপর্যপূর্ণ গল্প বেরোচ্ছে না। অন্তত আমার চোখে পড়ছে না। অধিকাংশ লেখকই পাঠকের মনোরঞ্জন করতে ব্যস্ত, মনকে অধিকার করতে তাঁরা চাইছেন না।

তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে আধুনিক লেখকরা গল্প লেখার দিকে বিশেষ মনোযোগও দিচ্ছেন না। উপন্যাসের পাঠক বেশি, তাতে পয়সা বেশি পাওয়া যায় বলে আধুনিক লেখকরা গল্পকে অবজ্ঞা করেন, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরকম মনোভাব একটি দারুণ আশঙ্কার কারণ। দু-চারখানা ভাল উপন্যাস বাংলায় লেখা হয়েছে এ-কথা ঠিক; কিন্তু বাঙালী প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে তারাশঙ্কর—প্রেমেন-মানিক কিছু কিছু এমন গল্প লিখেছেন যা বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। গল্পের সে ঐতিহ্যকে আমরা হারাতে বসেছি এ কী কম আপশোষের কথা!

আমার মনে হয় যুগ-সংকটের উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য এ-কালে ছোট গল্পের চেয়ে ভাল মাধ্যম আর নেই। উপন্যাসের অসুবিধে এই যে তার মধ্যে জীবনের বৃহৎ পরিচয় দিতে হয় বলে বাস্তবের বহিরঙ্গের প্রতি তার আনুগত্য অত্যন্ত বেশি। উপন্যাস বস্তু তথ্য ভারাক্রান্ত, অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ তাকে দিতে হয়, অনেক বাস্তবানুগ চরিত্র তাকে সৃষ্টি করতে হয়। আর সেই বিপুলায়তন বস্তুর ভারে জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধি হারিয়ে যায়। অন্তরের বেদনার ভারমুক্ত অলঙ্কারমুক্ত বিশুদ্ধ প্রকাশ সেখানে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ছোটগল্পের ক্ষীণদেহে কোন ভার না থাকলেও চলে। লেখক অনায়াসে নিতান্ত আজগুবি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে জীবনের গূঢ় উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে পারেন। ব্যঞ্জনায়, প্রতীক ধর্মিতায়, ছোটগল্প কাহিনীর সীমাকে ছাড়িয়ে বহু দূরে বহু গভীরে চলে যেতে পারে।

ছোটগল্প হচ্ছে অতসী কাচের ক্ষুদ্র দেহের ভিতর দিয়ে বাস্তবের বৃহৎ অংশকে দেখা, microcosmএর ভিতর দিয়ে macrocosmকে দেখা। ভূমির মধ্যে ভূমাকে দেখা। অন্য জাতের ছোটগল্পও যে না হতে পারে তা নয়; কাহিনীর সীমার মধ্যেই গল্পের তাৎপর্য শেষ এমন গল্পের সংখ্যাই তো পনের আনা। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে মনকে অবাধ সঞ্চরণে সাহায্য করার যে সম্ভাবনা ছোট গল্পের আছে সে কেবল প্রথম জাতের গল্পের ভিতরই সম্ভব। সেইজন্যই বিদেশী সাহিত্যে গল্পের একটু বৃহত্তর সংস্করণ আজকাল খুব জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরীর উপদেশটির কথা আমার স্মরণ আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের গল্প, চুটকিজাতীয় গল্প, কোন চটকদার ঘটনা কোন আকর্ষণীয় চরিত্র ছোটখাট সুখ-দুঃখ হিংসা-ভালবাসাকে কেন্দ্র করে লেখা গল্প,—সব দেশের সব কালের সাহিত্যেই এদের দেখা মিলবে। পত্র-পত্রিকাদিতে এদের সংখ্যাই বেশি থাকবে, এবং সেটা স্বাভাবিক। মানুষ সব সময়ই গভীর রসের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে না; হালকা রস, পরিচিত অভ্যস্ত রস,—এ-সবের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এ-জাতীয় গল্প লিখে ও. হেনরী পৃথিবী বিখ্যাত লেখক বলে পরিচিতি লাভ করেছেন। কাজেই সহজ রসের পুনরাবৃত্তিশীল রসের যাঁরা যোগান দেন তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কোন অভাব নেই। আমি শুধু দুশ্চিন্তা বোধ করি যখন রম্য-রচনার লেখকরা গল্প লিখতে শুরু করেন। জাত গল্পলেখকের নিতান্ত সামান্য গল্পের মধ্যেও এমন-কিছু সূক্ষ্ম রস থাকে যার খবর মজুতদার আলীরা বা জরাসন্ধরা রাখেন না। নরেন্দ্র মিত্রের তুচ্ছতম ঘটনার উপর লেখা গল্পের মধ্যেও নায়ক-মনের চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিচয় থাকে, কিছু অন্তর্মুখিনতা থাকে কাহিনীর উর্ধ্বে যার ব্যঞ্জনা পৌঁছুতে পারে। মজুতদার আলীদের কুশলী হাতের ভাষায় ব্যঞ্জনা থাকে, কিন্তু মোটা তুলিতে আঁকা রাজা-উজীরদের কাহিনীতে নিছক খানিকটা চমৎকারিত্ব থাকে, ব্যঞ্জনা থাকে না। এ-সব গল্প নেহাৎ-ই বাস্তবের অতিরঞ্জন, fancy-র সৃষ্টি, imaginationএর সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। বৈঠকী গল্প হিসেবে এগুলো খুব ভাল; গল্পের আড্ডায় আমিও শুনতে পেলে খুশি হব। কিন্তু বইয়ের পৃষ্ঠায় আমি এ-গুলো দেখতে চাই না। এ-সব গল্পের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ পাঠকের সূক্ষ্ম রুচিকে নষ্ট করে দেয়।

কিন্তু আপাতত বেশ-ভাল মাঝারি-ভাল কোনরকম-ভাল ভালই-তো জাতের গল্প আমার সমস্যা নয়। আমার আলোচনার প্রসঙ্গ সেই জাতের গল্প যারা চিহ্নিত, যারা পাঠকের মনের উপর দাগ কেটে বসে যায়, আর দু'চারদিন লাগে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। এ গল্প পাঠককে যুগ ও সভ্যতা সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে, দৈনন্দিনতা, প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠতে পাঠককে সাহায্য করে। কোন দেশের কোন সাহিত্যেই এ জাতের গল্প খুব বেশি লেখা হয় না; কিন্তু যে কয়টি লেখা হয় তাই দিয়েই সাহিত্যের পরিচয়।

দুর্নীতির বিষয়টা নিয়ে আমি একটু বেশি আলোচনা করেছি এই জন্য যে দুর্নীতি বাংলাদেশে আজ ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তার কারণ পশ্চিমী দেশগুলোর তুলনায় আমরা এখনো একটু বেশী আশাবাদী; দেশে যান্ত্রিকীকরণ আংশিকভাবে সাধিত হয়েছে, পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণের দিল্লীকা লাড্ডুটা দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত এই আশাবাদ বজায় থাকবে। কিন্তু দ্রুত পুনর্গঠনের পথে আজকের সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি। সেইজন্যই দুর্নীতি আজ মানুষকে এতখানি বিচলিত করে তুলেছে। এর মধ্যে আজ যুগ-সঙ্কটের রূপকে দেখতে পাচ্ছি। এবং এই দুর্নীতির মধ্যে কোন রাজনীতি নেই, কোন শ্রেণীসংগ্রাম

নেই, কোন ছোট-বড়র ভেদ নে। ধূলোর মতই এই বিষ দক্ষিণে বামে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

তার মানে এই নয় যে একমাত্র দুর্নীতির মধ্যেই যুগ-সংকটের লক্ষণ বর্তমান। বরং বিদেশে দুর্নীতির চেয়ে অন্যান্য প্রসঙ্গ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে,—যেমন যান্ত্রিকতার প্রভাবে জীবনের যান্ত্রিকীকরণ মনোপলি—গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক—ব্যক্তি মানুষকে বিরাট বিরাট সংগঠনের নাট-বল্টুতে পরিণত করছে, ইত্যাদি। এ যুগে মানুষ তার অস্তিত্বের মৌলিক কতকগুলো প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এমন সব আত্মিক এবং মানসিক সমস্যা নিয়ে মানুষ ভাবছে যা সাহিত্যিককে দার্শনিক করে তুলছে। ছোটগল্পে তার ছাপ পড়ছে। সুতরাং ভালো ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর অভাব নেই, যদিও বাংলা দেশে অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে।

তবে বাংলাদেশের গল্পেও যে মাঝে মাঝে বৃহত্তর সমস্যার ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে না এমন নয়। দু'একটি উদাহরণ দিয়ে আপাতত এ আলোচনা শেষ করব। বিজ্ঞান গর্ব করে বলে যে আমরা অজানা ভয়কে দূর করেছি, সমাধানের অতীত সমস্যাগুলোকে কমিয়ে এনেছি। সত্য জিজ্ঞাসু সাহিত্যিক জীবনের গভীরে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন যে মানুষের অস্তিত্বের মূলে কতকগুলো ট্রাজেডীর সম্ভাবনা আছে যা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমন-কি আধুনিক যন্ত্রব্যবস্থাও এমন কতকগুলো ট্রাজেডির জন্ম দিয়েছে যা মর্মান্তিক। সমরেশ বসুর একটি গল্প উল্লেখ করছি। ট্রেন দুর্ঘটনায় নায়কের দুটি পা-ই উরু অবধি কাটা গিয়েছে। সে থাকে একটি ঘরে তার ভাইদের আশ্রয়ে, অশক্ত, উপার্জনে অক্ষম হয়ে। তার নিঃসঙ্গ সহানুভূতিশূন্য পরনির্ভরশীল জীবনে সহস্র অতৃপ্ত বঞ্চিত কামনার চিন্তা তাকে দিশেহারা করে তোলে। স্বভাবতঃই তার ব্যবহারে চালচলনে বিকৃতি আর অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় আর ভাইরা সেজন্য তার উপর অত্যাচার করে। সমরেশ বসু এই বিকলাঙ্গের মানস যন্ত্রণার বিস্তারিত নিখুঁত চিত্র অত্যন্ত নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। পরিশেষে শেষরাত্রে দরজা খোলা রয়েছে দেখে সেই সুযোগ নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে মাটি ঘস্‌তে ঘস্‌তে গিয়ে অনেক দূরের একটি পুকুরে আত্মবিসর্জন দিল। গল্পটির বিশেষত্ব হচ্ছে ট্রাজেডির অনিবার্যতা। লোকটির মর্মান্তিক দুঃখকষ্টের জন্য বিশেষ ভাবে কাউকে দোষী করা যায় না। একটি বিকৃত দর্শন ও বিকৃত রুচির মানুষকে ঘরে রেখে জীবিত বলেই স্বার্থপর ভাইরা যে খুব স্বস্তি বোধ করে না ও দরকার বোধ করলেই তার উপর অত্যাচার করে এ খুব স্বাভাবিক। প্রতিবেশীরা যে তাকে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তৈরি করা পুতুল বলে মনে করে তা-ও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এত পুঞ্জীভূত অবজ্ঞা বিতৃষ্ণা পরিহাস অত্যাচারের লক্ষ্য যে, দুঃখের বিষয় তার একটি মানুষী হৃদয় আছে। কাহিনীর এই অনিবার্যতার জন্যই তার ব্যঞ্জনা বিশেষ থেকে সাধারণে গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা আমাদের চারপাশে যে-সব ছোটখাটো অনিবার্য ট্রাজেডির সম্ভাবনা দেখতে পাই, যেগুলোর জন্য আপাতত অপরকে দোষী বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে কেউ দোষী নয়, সেইগুলির কথা গল্পটি স্মরণ করিয়ে দেয়। বিমল করের একটি গুণহীন নারীর ও একটি কর্তিত-হাত পুরুষের গল্পও এই জাতের। কিন্তু এ রচনাগুলি অতখানি সার্থক হয়ে ওঠেনি বলে বিশেষ নির্বিশেষে পরিণত হয়নি।

এ প্রবন্ধে আমি যে-ক'টি গল্পের উল্লেখ করেছি সে-সবের অধিকাংশই হয় বিয়োগান্ত, হয় তো ব্যঙ্গাত্মক। তার কারণ বোধ করি এই, যে বর্তমান যুগটাই মূলতঃ ট্রাজিক। যে কোন

পূর্বযুগ থেকে এ যুগের মানুষ বেশি হাসছে, কিন্তু সে হাসির আড়ালে আছে কথা। লেখকের অন্তরের যুগোপলব্ধিতে যদি ট্রাজেডি বা নৈরাশ্যবাদ থাকে তবে পাঠকের রুচির খাতিরে বা সমালোচকের পুঁথিগত তত্ত্বের ভয়ে তাকে এড়িয়ে যাবেন এ দাবী হাস্যকর। কিন্তু গঠনমূলক উপলব্ধিও আছে, এবং তার একটি উদাহরণ দিয়ে এ আলোচনা শেষ করব। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি গল্প এক চিত্রশিল্পীর আত্মস্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত। শিল্পী জীবনে নারীর ভালবাসা পায়নি; বাসে ওঠার সময় কয়েকদিন ধরে একটি নারীকে সহযাত্রিণীরূপে পেয়ে শিল্পীর মনোযোগ তার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। জানতে পারল মেয়েটিও তার সম্পর্কে কৌতূহলী ও তাকে চেনে। সুতরাং আশা জাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা গেল মেয়েটির মন ইতিপূর্বেই অন্যত্র বাঁধা পড়েছে। মনে মনে দুঃখ বোধ করলেও শিল্পী এই সিদ্ধান্তে এল যে জীবনে অনেক অপূর্ণ কামনা সত্ত্বেও সে সার্থকতা লাভ করতে পারবে যদি সে তার প্রকৃতি প্রবণতা ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, আপাত ঔজ্জ্বল্য বা ফ্যাসানে মুগ্ধ না হয়ে, এক পরিপূর্ণ স্বকীয়তা অর্জন করতে পারে। গল্পটি যে পুরোপুরি সার্থক হয়েছে তা বলতে পারি না; কারণ সামান্য ঘটনার তুলনায় মনন বেশি এগিয়ে গিয়েছে; কিন্তু ছোটগল্পের এ দুয়ের যথাযথ পারম্পর্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু লেখক এমন একটি গ্রহণযোগ্য জীবন নীতিতে পৌঁছুতে চেয়েছেন যা তাঁর উপলব্ধি-সঞ্জাত বলেই মূল্যবান।

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক অনেক অর্থে দ্বিতীয় দশকের বিপরীত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিতীয় দশকে লেখকরা মানুষের কামনার অবাধ মুক্তি দাবী করেছিল; আজকে উদ্দাম উত্তাল বিকৃত কামনা অভিযুক্ত, কাঠগড়ার আসামী। দ্বিতীয় দশকের মার্কা-মারা ভাল ছাত্ররা ভাষার আশ্চর্য দীপ্যমানতায়, পরিশীলিত সংলাপে, বিন্যাসের চাতুর্যে পাঠকের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল আর্ট,—কী বলছি তার চেয়ে কীভাবে বলছি তার গুরুত্ব বেশি ছিল। বর্তমান দশকের অনেক লেখকই সাধারণ ঘরের সাধারণ ছাত্র, অনেকেরই পাণ্ডিত্য অনুল্লেখযোগ্য; তবু তাঁরা যেখানে আন্তরিকভাবে লিখছেন সেখানে যুগ-সঙ্কটের সত্য উপলব্ধিকে লিপিবদ্ধ করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। আর্টের বহিরঙ্গ যাই হোক আত্মজিজ্ঞাসাই আর্টের অন্তরঙ্গ। বর্তমান দশক অত্যন্ত কোলাহল-মুখর; সিনেমা, শস্তা জনপ্রিয়তা, সাহিত্যের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা—প্রভৃতি মিলিতভাবে সাম্প্রতিক লেখকদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে। কাজেই এই দশকের চিন্তা ও মনন আজও অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। কিন্তু যা প্রচ্ছন্ন, তাকে সুপ্রকাশ করাই সমালোচকের কাজ; লেখকরা যে-লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছেন অথচ যাকে এখনো চিনতে পারছেন না তাকে চিনিয়ে দেওয়াই সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সার্থকতার বিচারে বর্তমান দশক খুব স্থিরমাণ। তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের ছোটগল্পের আশ্চর্য সার্থক ফসলের সঙ্গে কোন তুলনা না-ই করলাম। এমন-কি দ্বিতীয় দশকের অনেক আপাত দ্যুতিময়তার মাঝে মাঝে যে ক্ষণদীপ্ত সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বর্তমান দশক সেখানেও খুব কদাচিৎ-ই পৌঁছুতে পেরেছে। তবু তরুণ লেখকরা যদি তাঁদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সাধনায় অগ্রসর হন তবে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

চৈতালী রাতের স্বপ্ন

উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়র

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ।

কুইন্‌স্‌, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রবেশ

বটম। আমরা সবাই হাজির?

কুইন্‌স্‌। সব ঠিকঠাক! আর এটা মহড়ার পক্ষে অত্যাশ্চর্য সুবিধের জায়গা। এই সবুজ মাঠের ফালিটা আমাদের স্টেজ; এই কাঁটাঝোপটা আমাদের সাজঘর; এখন রাজার সামনে ঠিক যেমন হবে তেমনি আমরা মহড়া দেব।

বটম। পিটার কুইন্‌স্‌।

কুইন্‌স্‌। কি বলছো; বটম গুড্ডা?
এই "পিরামুস ও থিসবি" নাটকে এমন কিছু জিনিস আছে যা অত্যন্ত কটুকাটব্য। প্রথমতঃ, পিরামুসকে এক তলোয়ার টেনে আত্মহত্যা করতে হবে। এটা মহিলারা সহ্য করতে পারবেন না। এর কি সমাধান করবে?

স্নাউট। মাইরি, এযে সাংঘাতিক বিপদ!

স্টার্ভলিং। আমার মনে হয় শেষমেষ আত্মহত্যাটা বাদ দিতে হবে।

বটম। কক্ষণো না। আমার মাথায় এক ফন্দী এসেছে যাতে সব সুরাহা হবে। আমাকে একটা ভূমিকা লিখে দাও; এই ভূমিকায় বলা হবে যে তলোয়ার দিয়ে কোনো রক্তারক্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং পিরামুস সত্যি সত্যি মরছে না। এমন কি, ওঁদের একেবারে নিশ্চিন্ত করতে বলে দেয়া যাবে যে আমি পিরামুস কি সত্যি পিরামুস? আমি আসলে তাঁতী বটম। এতে করে ওঁদের ভয় ভেঙে যাবে।

কুইন্‌স্‌। বেশ, লিখে নেয়া যাবে অমনি এক ভূমিকা। পয়ার ছন্দে আটমাত্রা ছ'মাত্রা সাজিয়ে লেখা যাবে।

বটম। দু'মাত্রা কম কেন? ওটা আটমাত্রা আটমাত্রায় লেখা হোক।

স্নাউট। মহিলারা আবার সিংহ দেখে ভড়কাবেন না তো?

স্টার্ভলিং। হ্যাঁ, ঠিক ভড়কাবে, আমি লিখে দিতে পারি।

বটম। বন্ধুগণ, নিজেরাই ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। একতোড়া মহিলার মধ্যে এক বিকট সিংহ আমদানী করাটা অত্যন্ত ভয়ংকর জিনিস। তোবা! তোবা! কারণ বনের বন্যপক্ষীর মধ্যে সিংহই সবচেয়ে বিকট। আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

স্নাউট। অতএব আরেকটা ভূমিকায় বলা হবে যে সে সত্যি সিংহ নয়।

বটম। শুধু তাই নয়; অভিনেতার নামটাও বলতে হবে; আর চামড়ার ফাঁক দিয়ে সিংহের ঘাড়ের কাছে লোকটার আধখানা মুখও দেখা যাবে। এবং সে নিজেই সেই ফাঁক দিয়ে বলবে—মানে এই প্রকরণের কোনো কথা বলবে আর কি, যে, 'মহিলাবৃন্দ', বা 'সমাগতা সুন্দরীসকল— আমার ইচ্ছা' বা 'আমার অনুরোধ' বা 'আমার উপরোধ, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না, আমার মাথা খান! যদি ভাবেন আমি সত্যি সিংহ হয়ে এখানে এসেছি, তবে আমার প্রতি বড় অবিচার হবে। না, আমি সিংহটিংহ নই; সব মানুষের মতন আমিও একজন মানুষ।' এবং এর পরে সে প্রণাম করে নাম বলে খোলসা করবে যে সে আসলে মিস্ত্রী স্নাগ।

কুইন্‌স্‌। বেশ তাই হবে। কিন্তু আরো দুটি কঠিন ব্যাপার আছে। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আনবো কি করে? কারণ, জানোই তো, চন্দ্রালোকে পিরামুস ও থিস্‌বি-র দেখা হবে।

স্নাউট। যে রাতে অভিনয় সে রাতে চাঁদ থাকবে আকাশে?

বটম। পাঁজি! পাঁজি! পঞ্জিকা দেখে নাও; চাঁদ দেখ, চাঁদ দেখ!

কুইন্‌স্‌। হ্যাঁ সে রাত্রে পূর্ণিমা।

বটম। তবে তো হয়েই গেল। যে ঘরে নাটক হবে সেখানকার জানলার একটা কপাট খুলে রাখবো; আর সে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকবে দুপাড় করে।

কুইন্‌স্‌। হ্যাঁ। আর তা না হলে একজন কেউ একহাতে কাঁটাগাছ অন্যহাতে লণ্ঠন নিয়ে এসে বলবে সে চাঁদমামার চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছে, মানে অভিনয় করছে। তারপর আর এক ঝামেলা আছে। স্টেজের ওপর একটা দেয়াল চাই যে, কারণ গল্পে আছে দেয়ালের ফুটো দিয়ে পিরামুস

আর থিস্‌বি প্রেমালাপ করেছিল।

স্নাউট। একটা আস্ত দেয়াল বয়ে আনা তো অসম্ভব। কি করা যায় বটম?

বটম। একজন কাউকে দেয়ালের ভূমিকায় নামতে হবে; তার সারা গায়ে লেপা থাকবে চুন, বা সুড়কি, বা স্রেফ গংগামাটি। আর আঙুলগুলো সে এমনি করে তুলে ধরবে; আর সেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিরামুস আর থিসবি ফিসফাস করবে।

কুইন্‌স্‌। তা যদি করা যায় তবে আর ভাবনা নেই। বোসো সবাই, বসে পড়ো, মহড়া দাও। পিরামুস, শুরু করো, পার্ট বলা হয়ে গেলে ঐ ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাবে, এমনি প্রত্যেকে নিজের নিজের পার্ট অনুযায়ী।

[পশ্চাতে পাক্‌-এর প্রবেশ]

পাক্‌। এরা কারা মাথামোটা, গেঁয়ো ভূতের দল? পরীরাণীর শয্যাপাশে করছে দাপাদাপি? একি? নাটক হচ্ছে নাকি? দর্শক হবো আমি; আবার অভিনেতাও হতে পারি, তেমন তেমন বুঝলে।

কুইন্‌স্‌। বলো পিরামুস। থিস্‌বি, ওঠো।

বটম। থিসবি; পুষ্পের যেমতি রন্ধ্র অনিন্দ্যসুন্দর—

কুইন্‌স্‌। রন্ধ্র কোথায়? গন্ধ, গন্ধ!

বটম। গন্ধ অনিন্দ্যসুন্দর,
তেমতি তব শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রেয়সী প্রিয়তমা!
তিষ্ঠ! এ কাহার স্বর? অপেক্ষ হেথা ক্ষণকাল!
প্রত্যাবর্তন করিব শীঘ্র; ওগো মনোরমা! [প্রস্থান]

পাক্‌। মনোরমার শ্বাস উঠিবে হেরি বদনচন্দ্রিমা। [প্রস্থান]

ফ্লুট। এইবারে বলতে হবে?

কুইন্‌স্‌। হ্যাঁ, নয়তো কি? ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? একটা শব্দ শুনে পিরামুস দেখতে গেছে, এক্ষুণি আবার আসবে।

ফ্লুট। উজ্জ্বলকান্তি পিরামুস, শ্বেতোৎপলবর্ণ!
কান্তারকণ্টকে প্রস্ফুটিত রক্তজবা যেমতি উঠে উছলি,
যৌবনকামোদরাগে সদা ছটফট, হৃদয়েশ্বর কাব্যুলি
বিম্বন্ত তুমি যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া। দেখা হবে পিরামুস মেনু-র কবর পার্শ্বে।

কুইন্‌স্‌। দেত্তেরি! মেনু কোত্থেকে এল? নিন, নিনু-র কবর পার্শ্বে! আর ওটা এক্ষুণি বলছো কেন?

কাকে বলছো? ওটা তো পিরামুস-এর কথার
জবাব। কি বিপদেই পড়লাম! তুমি কি তোমার
সব কথা একসংগে বলে যাবে নাকি? থামা-
টামার দরকার নেই? পিরামুস ঢোকো,
তোমার কিউ চলে গেছে যে;
'যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া' শুনেই ঢুকে পড়বে।

ফ্লুট। ও, বুঝেছি। 'বিশ্বস্ত তুমি যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া।'

[পাক্ এবং বটম্-এর প্রবেশ; বটম্-এর স্কন্ধোপরে গর্দভের মাথা]

বটম। যাহা মম তাহা তব, থিসবি, খোদ আমিই তব!'

কুইন্স্। কি ভীষণ! কি আশ্চর্য!' ভূতে ভর করেছে!
ভগবানকে ডাকো সবাই! পালাও সবাই!
মেরে ফেললে!

[কুইন্স্ স্নাগ, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রস্থান]

পাক। আসছি তোদের পিছে আমি, নাচ নাচাবো তেড়ে,
পচা পাঁক আর ঝোপঝাড় কাঁটা জলবিছুটি ফেড়ে,
ঘোড়া সেজে, কুকুর সেজে, শুয়োর ভালুক কবন্ধ
আগুন হয়ে হলকা হেসে করবো তোদের অন্ধ!
চিঁহি রবে, ঘেউ ঘেউ করে; ঘোঁৎ ঘোঁৎ, হুম হাম, দাউ দাউ,
ঘোড়া, কুকুর, শুয়োর, ভালুক, আগুন দেখে হাউমাউ! [প্রস্থান]

বটম। পালায় কেন? এসব ওদের বজ্জাতি, আমাকে ভয় দেখাবার ফন্দী।

[স্নাউট-এর পুনঃপ্রবেশ]

স্নাউট। হায় হায় বটম, তুমি বদলে গেছ! একি দেখছি তোমার
ঘাড়ে?

বটম। কি দেখছিস! তোর ঘাড়ে কটা মাথা? নিজে যেমন
গাধা তুই, তাই সবাইকে ভাবিস গাধা, নাকি?

[স্নাউট-এর প্রস্থান। কুইন্স্-এর পুনঃপ্রবেশ]

কুইন্স্। ছেড়ে দাও, বটম, ছেড়ে দাও। তুমি আর তোমাতে
নেই। তুমি অনূদিত। তুমি তর্জমা হয়েছ। [প্রস্থান]

বটম। হুঁ, ধরেছি বজ্জাতি। আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা!
ভয় দেখাবার মতলব! বাবা, এ কণ্ডি বড় দড়;
এইখানেই জাঁকিয়ে বসবো, যা ইচ্ছে করুক।
এখানে পায়চারি করবো। চেঁচিয়ে গান গাইবো,
যাতে ব্যাটারা শুনে বোঝে ভয়ডর আমার ধাতে
নেই।

গান

কোকিল যতই কালো হোক
গান কি তারি কালো?

কাকাতুয়া-র কথা যা হোক,
ঝুঁটিখানি ভাল।

টিটানিয়া। [জাগিয়া] সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমায় জাগালো
কোন দেবদূত?

গান

শালিক, বাবুই, মাছরাঙা,
বউ-কথা-কও গায়,
শোনে সবাই ঘুম-ভাঙা,
নিজের কাজে যায়।
না গিয়ে উপায় কি? অমন বোকা পাখীর সংগে
কথা কয়ে বুদ্ধি বাজে খরচ করার কোনো অর্থ
হয়? কার দায়ে পড়েছে যে বলবে, ব্যাটা মিথ্যেবাদী
বউ কথা কও মানে? এত হাজার বছর ধরে বউ একটা কথাও
কয়নি? এও বিশ্বাস করতে হবে? অমন মিঠে
করে বউ-কথা-কও বললে কি হবে? সব গুল!

টিটানিয়া। মিনতি আমার, হে লোকালয়বাসী, আবার গাও!
তোমার গান করেছে আমার কানের মন চুরী।
আর চোখকে আমার করেছে যাদু ঐ মনোহর মূর্তি।
আর তোমার অন্তরে যে অনন্ত পৌরুষ তাতে মুগ্ধ আমি,
তাই প্রথম দর্শনেই বলছি তোমায়, শপথ করছি,
তোমায় ভালবাসি।

বটম। মাঠাকরুণ, বিবেচনা করে দেখুন, ওসব গদগদ
কথার কারণ নেই। তবে, সত্যি কথা বলতে কি,
দিনকাল যা পড়েছে, তাতে বিবেচনা আর প্রেমাপ্রেমির
মধ্যে খুব একটা সম্ভাব নেই। পরিতাপের বিষয়;
একটা সাদামাটা পড়শি নেই যে দুটির ঝগড়াটা
মিটিয়ে দেয়। দেখছেন? দরকার পড়লে রসিকতাটা
আমার মন্দ আসে না।

টিটানিয়া। যেমন তোমার রূপ, তেমনি তোমার প্রজ্ঞা।

বটম। না, না, তা তেমন নেই। মানে এই বন থেকে
বেরুবার বুদ্ধিটুকু জোগালেই চলবে, উদ্ধার হয়ে
যেতাম; প্রজ্ঞাটজ্ঞার দরকার নেই।

টিটানিয়া। এ বন ছেড়ে কোথাও তোমার চলবে নাক' যাওয়া;
ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক থাকতে হবে হেথা।
দেখ চেয়ে, নই তো আমি সামান্যা অপ্সরী;
দেহে আজো আছে রূপ যৌবন বসন্তেরি;
আর ভালবাসি তোমায়; তাই এস আমার সাথে,
দেব তোমায় পরীর দল, সেবা দিনে রাতে;

আনবে তারা সাগর সেঁচে মহামূল্য মণি;
ঘুম পাড়াবে ফুলশয্যায় গানে প্রহর গণি।
মৃত্যুর দাস মানুষের যত জড়তা ঝেড়ে ফেলে,
মুক্ত হয়ে ভাসবে তুমি শূন্যে পাখা মেলে।
কুমড়োফুল! উর্ণনাভ! মক্ষিরাজ! সর্ষেগুঁড়ো!

[পরীদের প্রবেশ]

প্রথম পরী। এই যে আমি!
দ্বিতীয়। আর আমি!
তৃতীয়। আর আমি!
চতুর্থ। আর আমি!
সকলে। কোথায় যেতে হবে?
টিটানিয়া। এই ভদ্রলোককে তোয়াজ করো, প্রণাম করো এঁকে;
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলো, হাসি আনো মুখে,
কুড়িয়ে আনো কিসমিস যত বনের ভেতর থেকে,
বেগুনে আঙুর, সবুজ ডুমুর, ডালিম খাওয়াও এঁকে,
মৌমাছির কণ্ঠ চিরে আনো মধু ছেঁকে;
মোমে-ভারী ডানায় মাছির জোনাকীর আগুন সেঁকে,
রাতের আঁধার দূর করে জ্বালো বাতি লাখে লাখে
আহার বিহার করবে প্রিয় সেই আলোতে পথ দেখে
রঙীন প্রজাপতির পাখা পাতো বন্ধুর চোখে,
ঘুম যেন না ভাঙে চাঁদের দুষ্টু জ্যোৎস্নালোকে।
গড় করো এঁকে, পরীর দল, মাথা নোয়াও ঝুঁকে।
প্রথম পরী। জয় হোক, মনুষ্যসন্তান!
২য় পরী। জয়!
৩য় পরী। জয়!
চতুর্থ পরী। জয়!
বটম। অধমের 'পরে দয়া রেখো, বাবাসকল! হুজুরের নামটা যেন কি?
দ্বিতীয়। উর্ণনাভ!
বটম। উর্ণনাভ মশাই, আপনার সংগে মিতালি পাতাবার ইচ্ছে আছে। আঙুল কেটেটেটে গেলে আপনার জাল বুনে বেঁধে দেবেন, কেমন? আপনার নাম, মহাশয়?
প্রথম। কুমড়ো ফুল।
বটম। আপনার মা পটলদেবী আর আপনার বাবা লাউমহারাজকে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করবেন। কুমড়োফুল মশাই, আপনার সংগেও বন্ধুত্ব পাতাবার ইচ্ছে রইলো। আপনার নামটা বলবেন দয়া করে?

চতুর্থ। সর্ষেগুঁড়ো।
বটম। সর্ষেগুঁড়ো মশাই, আপনার পরিবারের ধৈর্য দেখে আমি অবাক। সর্ষেবাটা দিয়ে রান্না করে লোকে আপনাদের কতজনকে পিষে মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই। আপনাদের জন্যে লোকের চোখে জল আসে। আরো ভালো করে আলাপ করা যাবে 'খন।
টিটানিয়া। সেবা করো ওর, নিয়ে এস ওকে আমার কুঞ্জবনে,
আজকে যেন চাঁদের চোখে অশ্রু টলমল,
পৃথিবীর ফুল চাঁদের দুঃখে কাঁদছে মনে মনে,
কৌমার্যের ব্রত নিয়েও প্রকৃতি চঞ্চল।
কথাটি নয়; নারীব্রতা ঢাকুক বনস্থল।

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যের অন্য অংশ।

ওবেরন-এর প্রবেশ

ওবেরণ। টিটানিয়ার ঘুম কি ভেঙেছে? আর যদি ভেঙে থাকে,
কি দেখেছে সে নয়ন খুলেই, কার প্রেমে মজেছে?

[পাক্-এর প্রবেশ]

ঐ যে আসছে আমার দূত।
এই যে, পাগল নিশাচর!
ভৌতিক রাতের বনমর্মরে কিসের বারতা এনেছিস?
পাক্। রানী মোদের প্রেম করছে এক বিরাট জীবের সংগে।
পবিত্র তাঁর কুঞ্জবনে এসেছিল নাট্যরংগে
মেতেছিল মহড়ায় এক দংগল চাষী,
কড়া-পড়া হাত তাদের শ্রমিক শহরবাসী;
রুটির জন্যে গতর-খাটা আজীবনের পেশা,
রাজার বিয়েতে নাটক করবে চেপেছে বেজায় নেশা।
রানী তখন নিদ্রামগ্না অলস রাতের আবেশে;
দলের যেটা সেরা বোকা সেই মাথামোটা শেষে
ঢুকলো এসে ঝোপের ভেতর মহড়ার মাঝে
নাটকে সে অভিনেতা পিরামুস-এর সাজে।
সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুণ্ডু নিলাম কেড়ে,
বদলে তার পরিয়ে দিলাম গাধার মাথা ঘাড়ে।
একটু পরেই থিসবি প্রিয়া চেঁচিয়ে তাকে ডাকে;
অর্ধগাধা মূর্তি নিয়ে বেরুলো ঝোপের থেকে।
শিকারী-গুলির শব্দে ভীত বিগড়ি হাঁসের মতন,

বা খয়েরি মাথা ময়নার ঝাঁক আকাশে ওড়ে যেমন,
দেখেই তাকে বন্ধুর দল ছোটে ছত্রভংগ
ছুটতে ছুটতে উল্টে পড়ে, পালা হোলো সাংগ;
পড়ে গিয়ে চেঁচায় তারা, খুন করলে, খুন!
তার ওপরে আমি জুটে হাড়ে ধরাই ঘুণ!
বিষম ভয়ে বুদ্ধিলোপ, আতংকেরই চোখে
চারিদিকে কল্পনায় বিভীষিকা দেখে।
মনে হয় লতাপাতা কাঁটাগাছের ডাল
ছোঁ মারছে কেড়ে নিতে টুপী, জামা, শাল।
পাগলা ভয়ে দৌড় করালাম, বনজুড়ে কি আলোড়ন!
রইল পড়ে পিরামুস-এর নব-সংস্করণ।
সেই মুহূর্তে টিটানিয়া হঠাৎ জেগে উঠলেন
আর সড়াক করে অমনি তিনি গাধার প্রেমে পড়লেন।

ওবেরন। এ যে মেঘ না চাইতে জল! আশার অতিরিক্ত!
আর সেই শহুরে বাবুর কি হোলো? দিয়েছিস চোখে
প্রেমাঞ্জন? ভরেছে তার চোখ? কাজটা করেছিস?

পাক্। হ্যাঁ, কাজশেষ, ঘুমন্ত দেখলাম তাকে;
আর অদূরে তার উপেক্ষিতা প্রেমিকা!
জেগে উঠেই চোখাচোখি না হয়ে উপায় নেই।

[হার্মিয়া ও লাইস্যান্ডার-এর প্রবেশ]

ওবেরন। গা ঢাকা দে, এই যে সেই ছোঁড়া।

পাক্। এই সেই ছুঁড়ি, ছোঁড়া তো এটা নয়।

ডিমিট্রিয়াস। কেন বকছো তাকে যে তোমার প্রেমে আকুল;
এ গঞ্জনার তিক্ততা শুনুক তোমার শত্রুকুল।

হার্মিয়া। এখন শুধু মুখে বলছি, এর পরে মারবো,
তোমার মতন বেহায়াকে টিট করে ছাড়বো।
নিদ্রিত লাইস্যান্ডার তোমার হাতে হয়েছে খুন,
রঞ্জিত হাত তারই রক্তে, তোমার এমন গুণ।
তবে ছোরা তোমার বিঁধিয়ে দাও আমূল আমার বুকে,
আমাকেও মেরে ফেল।
সূর্য যেমন দিনের চিরসাথী,
লাইস্যান্ডার আমার তেমনি; আমায় নিদ্রিত ফেলে
সে যেতে কি পারে চলে? বিশ্বাস করি না আমি।
তার আগে ধরিত্রী দ্বিধা হবে, সে রন্ধ্রপথে
চন্দ্র ছুটে যাবে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে;
যেখানে এখন সূর্যের রাজা, ভস্মীর চপলতায়
সূর্য হবে ক্ষুব্ধ। তাই নিশ্চয়ই তুমিই তাকে হত্যা করেছ;
হত্যাকারীর মতনই তোমার মুখ প্রাণহীন নিষ্ঠুর।

ডিমিট্রিয়াস। হত্যাকারী নয়; নিহতের মতন আমার শীর্ণমুখ;
হৃদয় বিদীর্ণ তোমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে;
হত্যাকারী তুমি, অথচ তোমার কি উজ্জ্বল মুখ কি জ্যোতির্ময়,
নিজকক্ষে অধিষ্ঠিতা স্বাতী-নক্ষত্রের মতন।

হার্মিয়া। লাইস্যান্ডারের কি করেছ? কোথায় সে?
মিনতি রাখো ডিমিট্রিয়াস, ফিরিয়ে দাও ওকে।

ডিমিট্রিয়াস। ওকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

হার্মিয়া। দূর হ! কুকুর কোথাকার! দূর হ'! নারীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে;
মনে থাকে যেন! কি? তবে খুনই করেছ তাকে?
এরপরে আর মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিও না।
একবার, একবার সত্যি কথা বলো, আমার মুখ চেয়ে বলো!
ও জেগে থাকতে তো সাহস হয়নি; অসহায় নিদ্রিতকে মেরেছে!
কি সাহস! বিছে বা সাপের মতন তোমার বীরত্ব!
সত্যি দুমুখো সাপের চেয়েও তুমি ক্রূর বেশি।

ডিমিট্রিয়াস। অনর্থক উত্তেজনায় বলক্ষয় করছো।
লাইস্যান্ডারের গায়ে হাত দিইনি, মরেছে কি না জানিও না।

হার্মিয়া। তবে বলো, সে ভাল আছে?

ডিমিট্রিয়াস। ধরো বললাম, কি পাবো?

হার্মিয়া। জীবনে আমার মুখদর্শন না করার অধিকার।
তোমার ঘৃণ্য সংগ ছেড়ে যাচ্ছি বনের মাঝে,
লাইস্যান্ডার বাঁচুক মরুক, তোমায় চাই না কাছে। [প্রস্থান]

ডিমিট্রিয়াস। ওর এই রণরংগিণী মেজাজ থাকতে পিছে ঘোরা বৃথা;
এইখানটায় বসে খানিক ঠান্ডা করি মাথা।
ব্যর্থ প্রেমের ক্লান্তি যেন আরো ক্লান্ত, নিঃঝুম,
দুঃখের কাছে চুল বিকিয়ে দেউলে হোলো ঘুম;
ঋণের দায়ে পালিয়ে-বেড়ানো ঘুমকে ধরতে হবে;
শুয়ে থাকি, হয়তো এসে খানিক শান্তি দেবে।

ওবেরন। এ কি করেছিস? ভুল করেছিস! এ মেয়েটি কে?
রস দিয়েছিস অনুরক্ত কোন প্রেমিকের চোখে,
গোল বাধিয়ে খাঁটি প্রেমে দিয়েছিস ভেজাল;
ভেজাল প্রেমকে খাঁটি করতে পারলো না তোর চাল।

পাক্। তবে বিধি হয়েছে বাম! এইতো জানি লক্ষ মানুষ কপট ভালবাসে;
তার মানে যে একটা আবার সাচ্চা প্রেমিক আসে,
এটা জানবো কেমন ক'রে?

ওবেরন। বায়ুবেগে ছুটে যারে বন ভেদ ক'রে,
এথেন্স্-এর হেলেনাকে বার কর খুঁজে।
অভিমানে পাগলিনী, প্রেমের দীর্ঘশ্বাসে,
রক্ত শূন্য পান্ডুর মুখে বিষাদের হাসি হাসে।

মরীচিকার মায়াঘোরে ভুলিয়ে আন এখানে
তাকে সামনে রেখে এই ছোঁড়াকে দাওয়াই দেব টেনে!

পাক্। এই চললাম, এই চললাম, দেখুন ভৃত্য কেমন ওড়ে
তাতার দস্যুর ধনুক-ছেঁড়া তীরের থেকে জোরে! [প্রস্থান]

ওবেরন। কন্দর্পের তীরের স্পর্শে,
বেগুনে ফুলের মদ্য রসে,
চোখের মণি যেন ভাসে!
প্রেমিকাকে দেখলে শেষে
চোখে যেন মোহ আসে,
মেয়েটি তখন দূর-আকাশে
তারার মতন যেন হাসে।
ইন্দ্রজাল এ সর্বনেশে
ঐ মেয়ের পায়েই লোটা শেষে।
[পাক্-এর পুনঃপ্রবেশ]

পাক্। পরী ফৌজের সেনাপতি!
হেলেন আসছে দ্রুতগতি!
আর ভুল করে যে ছোঁড়াটা
ওষুধ পেয়ে চেতে ওঠা
আসছে মেয়ের পিছু পিছু,
প্রেমের মূল্য চায় সে কিছু।
দেখবেন এখন প্রেমাভিনয়ের ধোঁকা।
হায় ভগবান! মানুষ কি অসম্ভব বোকা!

ওবেরন। সরে দাঁড়া! যে হট্টগোল দু'জনে বাধাবে,
তাতেই ওরা ডিমিট্রিয়াস-কে জাগাবে।

পাক্। তখন দু'জনেতে একইজনকে প্রেম নিবেদন করবে,
হাসতে হাসতে দর্শকের পেটে খিল ধরবে।
আমার বিশেষ পছন্দ হয় ঐই ধরণের কাণ্ড,
যেথায় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ছন্দ লম্ভভণ্ড!

লাইস্যাণ্ডার। কেন ভাবছো ভালবাসার অভিনয় করছি?
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অভিনয় কেউ করে?
দেখ, প্রেমের অংগীকারের সাথে অশ্রুমোচন করছি;
অশ্রুজাত অংগীকারে সত্য বিরাজ করে।
একেও তুমি উপহাস কেমন করে ভাবছো?
চোখের জলের লিখন এতে; সত্যনিষ্ঠা স্বচ্ছ।

হেলেনা। ক্রমশঃ তোমার চাতুরী তার পক্ষবিস্তার করছে;
নূতন শপথে, পুরোণো শপথ ভাঙছো খান খান!
হার্মিয়াকে যে দিয়েছে কথা তা যে পদদলিত হচ্ছে।
এদিকেও শপথ, ওদিকেও শপথ, নিক্তি রইলো সমান!

দাঁড়িপাল্লার দুই দিকে দু'রকমের কথা,
সমান হাল্কা, অবিশ্বাস্য অলীক রূপকথা।

লাইস্যাণ্ডার। ওকে যখন কথা দিই, বুদ্ধি তখন পাকেনি।

হেলেনা। বুদ্ধি এখনো অপক্ক, কথা যখন রাখোনি।

লাইস্যাণ্ডার। বোকামি কোরো না, শোনো। ডিমিট্রিয়াস ওকেই ভালবাসে,
তোমায় তো দেখতে পারে না দু'চক্ষে!

ডিমিট্রিয়াস। [জাগিয়া] হেলেন! দেবী, বনপরী, তিলোত্তমা, অপ্সরী!
তোমার চোখের তুলনা কোথায়? কোথায় ওদের জুড়ি?
ওদের পাশে স্ফটিক ঘোলাটে! ঠোঁট দুটো কি পক্ক,
ডাকে রসালো রাঙা চুম্বনে, পরাহত সব তক্ক!
পূবের হাওয়ায় নিদ্রিত উঁচু গিরিশিখরের তুষার,
মূর্ত শুভ্রতা; তোমার হাতের বর্ণচ্ছটায় অসার,
কাকের মতন কালো। দাও হাতখানা, চুমো খাই,
শুভ্র এই কুমারীর কাছে ভবিষ্যতের পরশ পাই।

হেলেনা। কি নিষ্ঠুর! কি অন্যায়! বুঝেছি, তোমরা সকলে মিলে
লুঠতে চাইছো মজা আমায় ছিনিমিনি খেলে।
ভদ্র যদি হতে তোমরা, জানতে যদি শিষ্টাচার,
অসহায় এক নারীর 'পরে করতে না এই অত্যাচার।
জানি আমায় ঘৃণা করো; সেই ঘৃণাই কি শেষ নয়?
তার ওপরে নৈবদ্য-চূড়া এই উপহাসের অভিনয়?
দেখতে তোমরা পুরুষের মতন, পুরুষই যদি হও,
তবে ভদ্রমহিলার সংগে কথা ভদ্রভাবে কও।
প্রেম জানাচ্ছো, রূপের গাইছো দীর্ঘ জয়গান!
বুকে চেপে বিষম ঘৃণা, এ কি অপমান!
হার্মিয়াকে ভালবাসো, তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বী,
আজ হেলেনাকে ব্যাংগ করতে হয়েছে কোনো সন্ধি।
কি তোমাদের বীরত্ব! কি আশ্চর্য পৌরুষ!
দেখতে চাইছো নারীর চোখে অশ্রুধারার জৌলুষ!
থাকতো যদি অন্তরেতে বিন্দুমাত্র মহত্ত্ব
খেলার ছলে অসহায়কে করতে না উদ্যত্ত।

লাইস্যাণ্ডার। ডিমিট্রিয়াস, তুমি দয়াহীন, এমন কাজ করে না, ছিঃ, শোনো!
হার্মিয়াকে ভালবাসো, আমিও জানি, তুমিও জানো।
শোনা সবাই বলছি হেঁকে, আন্তরিক এই উপহার,
হার্মিয়ার ওপর সকল দাবী নিচ্ছি করে প্রত্যাহার;
বদলে দাও হেলেনাকে, তুমিও দাও ছেড়ে,
ভালবাসি হেলেনাকে, বাসবো জীবন ভরে।

হেলেনা। বৃথা প্রেমের পরিহাসে অতি-লোভী মরে।

ডিমিট্রিয়াস। লাইস্যাণ্ডার, দরকার নেই উপহার,

হার্মিয়া তোমার থাকুক, হঠাৎ কেন উদার?
হার্মিয়াকে কিঞ্চিৎ ভাল যদি বেসেও থাকি,
সে ভালবাসা উবে গেছে, কিছুই তার নেইকো বাকি।
হৃদয় আমার যাত্রীসম বেঁধেছিল ডেরা,
হেলেনই তার গৃহকোণ, তাই এবার ঘরে ফেরা—
চিরদিনের মতন।

লাইস্যাণ্ডার। হেলেন, একথা কি সত্য?

ডিমিট্রিয়াস। প্রেমের কিছু বোঝো? তুমি কামের মদে মত্ত!
আর এগিও না, বিপদ হবে, মুষ্টিযোগের ক্রিয়া!
ঐযে আসছে তোমার প্রেমিকা, ঐযে তোমার প্রিয়া!

[হার্মিয়া-র পুনঃপ্রবেশ]

হার্মিয়া। কালো রাত্রি ছিনিয়ে নেয় মানব-চোখের দৃষ্টি;
কানকে করে আরো তীক্ষ্ণ, সজাগ শ্রবণ সৃষ্টি;
ফিরিয়ে দেয় সে দ্বিগুণ প্রমাণ চোখ থেকে যা নেয় সে কেড়ে
শ্রবণই তখন আঁধারে আলো, অনুভূতি সব কর্ণকুহরে।
লাইস্যাণ্ডার, আমার চোখ তোমায় পায়নি খুঁজে;
এসেছি শুনে শুনে কণ্ঠস্বর অন্ধ বনের মাঝে;
আমায় একা ফেলে দয়াহীন তুমি চলে এলে কেন বলো!

লাইস্যাণ্ডার। মরমে জেগেছে প্রেমের তান পড়ে থাকি কি করে বলো!

হার্মিয়া। আমার পাশ থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমায় এ আবার কি প্রেম?

লাইস্যাণ্ডার। হেলেনার রূপ পাগল করেছে; রাতের মাঝারে হেম;
নিশীথ আকাশের লক্ষ চক্ষুর অগ্নিময় আভা
হেলেনার পাশে নিস্তেজ তারা, লুপ্ত তাদের প্রভা।
আমার পেছনে ঘুরছো কেন? বোঝো না দেখেশুনে?
যে দেখতে পারি না দুচক্ষে, তাই মুক্তি পলায়নে?

হার্মিয়া। এই কি তোমার মনের কথা? কক্ষনো না!

হেলেনা। ওহো! এ-ও আছে এই ষড়যন্ত্রে? আমায় ছলনা!
বুঝেছি এবার, তিনজনে মিলে করেছে অভিসন্ধি,
ঘৃণার উপহাসের কারায় আমায় করবে বন্দী!
পোড়ারমুখী হার্মিয়া! অকৃতজ্ঞ, হতচ্ছাড়ি!
এদের দলে ভিড়ে তুই আমায় ঠাট্টা করিস!
এতদিনের মান-অভিমান, এতদিনের মিতালি,
প্রতিদিন যে বিদায়বেলায় দুর্বারগতি মহাকালকে
দিয়েছি দুজনে অভিশাপ, সব ভুলে গেলি?
ছাত্রীজীবনের বন্ধুত্ব, শৈশবের নিষ্পাপ অনুরাগ?
হার্মিয়া মনে নেই? কতদিন দু'জনে সেজেছি নকল ভগবান
সৃষ্টি করেছি একটি ফুল একই শালের 'পরে,
বসে একাসনে! গেয়েছি একই গান, একই সপ্তকে

মাঝে মাঝে হয়েছে মনে, তুই আর আমি
এক দেহ, এক কণ্ঠ, এক প্রাণ। এইভাবে বড় হয়েছি,
এক বৃন্তে দুই ফল; দেখতে পৃথক, মূলে এক,
বিভিন্নতায়ও আশ্চর্য ঐক্য। সেই পুরাতন প্রেমকে আজ ছিঁড়বি?
দুই ছোটলোকের সংগে মিশে তোর বন্ধুকে করবি নির্যাতন?
বন্ধুত্বের একি পরিণাম? নারীত্বের একি প্রকাশ?
শুধু আমার নয়, সব নারীজাতির অভিশাপ কুড়োবি?

হার্মিয়া। এসব কি বলছিস উন্মাদের মতন? তোকে ঠাট্টা করবো কেন?
দেখেশুনে মনে হচ্ছে তুই-ই আমাকে ঠাট্টা করছিস!

হেলেনা। ন্যাকা সাজিসনি! লাইস্যাণ্ডারকে তুই-ই পাঠাসনি?
বলিসনি তাকে আমার মুখচোখের জয়গানে মুখর হতে?
আর তোর অন্য গুণমুগ্ধ ডিমিট্রিয়াস
একটু আগে আমায় পদাঘাতে করে গেল প্রত্যাখ্যান,
হঠাৎ সে আমায় দেবী, বনপরী, স্বর্গের অপ্সরী,
প্রেয়সী, তিলোত্তমা—এসব বলে কেন?
যাকে দেখতে পারে না তাকে এসব বলার কারণ কি?
তোর যোগসাজস ছাড়া এ ঘটতে পারে?
আর লাইস্যাণ্ডার হঠাৎ তোকে বিমুখ করে কেন?
তোর প্রেমে তো উথলে উঠতো ওর বুক! আর আজ
কিনা আমাকে করে প্রেমনিবেদন!! ছি ছি!
তোর প্ররোচনা, তোর সম্মতি না থাকলে এ হয়?
হতে পারে তোর মতন রূপ আমার নেই,
তোর মতন আমার নেই গুণমুগ্ধের ঝাঁক।
তবু প্রেম দিয়ে যে প্রেম পায়নি তাকে করুণা করা উচিত;
এই অবজ্ঞার কোনো অর্থ হয়?

হার্মিয়া। কিছুই মাথায় ঢুকছে না কি বলছিস!

হেলেনা। বাঃ, শাবাশ, ঠিক আছে, চালিয়ে যা!
মুখটাকে কর কাঁদো কাঁদো, আর আমি পিছু ফিরলেই
জীভ বার করে ভেঙিয়ে দিস! আর চোখ টিপে
ওদের সংগে হাসাহাসি কর! এমন রসিকতা কি গাছে ফলে?
চালিয়ে যা, ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।
ভদ্রতা বা আদবকায়দা যদি জানতিস
তবে এমন করে আমায় অপদস্থ করতে বাধতো!
চলি, বিদায় দে; আমারই দোষ; চলে যাবো দূরে,
বা মরবো শিগ্গির, এ ব্যথা ভুলতে দেরী হবে না।

লাইস্যাণ্ডার। দাঁড়াও, সুন্দরী, শোনো আমার বক্তব্য;
তুমি ধন, তুমি জীবন, তুমি হৃদয়েশ্বরী সুন্দরী হেলেনা!

হেলেনা। বাঃ, চমৎকার!

হার্মিয়া। একি প্রিয়তম! এমন করে ঠাট্টা করতে আছে?
ডিমিট্রিয়াস। ঠিক! হার্মিয়া-র কথা শোনো, লাইস্যাণ্ডার,
নইলে আমি বলপ্রয়োগ করে বসবো!
লাইস্যাণ্ডার। সে গুড়ে বালি! এর মিনতি আর তোমার লম্ফঝম্ফ,
সব অরণ্যে রোদন! হেলেনা, তোমায় ভালবাসি!
মাথার দিব্যি, সত্যি বলছি! যে উল্লুক বলবে
আমার প্রেম মিথ্যা, তাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে প্রাণ দেব—
সেই প্রাণ সাক্ষী আমার, তোমায় ভালবাসি!
ডিমিট্রিয়াস। এই, খবরদার! হেলেন, এর চেয়ে আমার প্রেম বেশি!
লাইস্যাণ্ডার। বটে? আয় তো দেখি, প্রমাণ দে তো দেখি?
ডিমিট্রিয়াস। এক্ষুণি! আয়!
হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডার! এসব কি হচ্ছে?
লাইস্যাণ্ডার। যা, ভাগ্, কেলোবতী!
ডিমিট্রিয়াস। না, না, বীরপুরুষ! অন্ততঃ হাত ছাড়াবার অভিনয়টা করো!
ভাব দেখাও আসবে যেন আমার পিছু পিছু,
তারপর কেটে পোড়ো। তুমি বড় কাপুরুষ, ছোঃ!
মেয়ের করতলগত হয়ে থাকো, ছেড়ে দিলাম যাও!
লাইস্যাণ্ডার। ছাড়্ আমাকে, বেড়াল কোথাকার! চোরকাঁটা!
ছিনে জোঁক, ছাড়্ বলছি, নইলে দেব এইসান ঝাঁকুনি,
সাপের মতন চেপ্টে থাকবি মাটিতে!
হার্মিয়া। এমন মুখখারাপ করছো কেন? এসব কি হচ্ছে?
আমাদের ভালবাসা কি—
লাইস্যাণ্ডার। তোর ভালবাসা! বেরো, হলদেচুলো গেছোমেয়ে, বেরো!
বেরো, নিমের পাঁচন কোথাকার! চিরতার জল, বেরো!
হার্মিয়া। এসব ঠাট্টা করছো তো!
হেলেনা। হ্যাঁ, করছে, তুইও করছিস তাই!
লাইস্যাণ্ডার। ডিমিট্রিয়াস, কথা রাখবো, আসছি এক্ষুণি লড়তে।
ডিমিট্রিয়াস। তোমার কথার বন্ধন বড় শিথিল বন্ধু।
একটা মেয়ের বাঁধন কাটাতে পারো না, কথার বাঁধনে বিশ্বাস কি?
লাইস্যাণ্ডার। কি করবো বলো! দু'ঘা বসিয়ে দেব? মেরে ফেলবো?
ছুঁড়িকে দেখতে পারি না! কিন্তু মেয়ের গায়ে হাত!
হার্মিয়া। আমাকে ছুঁড়ি বললে! গায়ে হাতের আর বাকি কি?
দেখতে পারো না? কেন? সর্বনাশ! কি হয়েছে লাইস্যাণ্ডার?
আমি তোমার হার্মিয়া! তুমি আমার লাইস্যাণ্ডার!
রূপ আমার এক রাতেই তো যায়নি মুছে।
আজ রাতেই তো আমায় ভালবেসেছিলে। তবে কি—
ভগবান না করুন—আমায় সত্যি ছেড়ে যাবে?
তাই কি ফেলে পালিয়ে এসেছিলে? এসব তবে ঠাট্টা নয়?

লাইস্যাণ্ডার। না, ঠাট্টা নয়। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না আর।
তাই ছাড়ো আশা, ছাড়ো তর্ক, ছাড়ো সন্দেহ;
নিশ্চিন্ত থাকো, এসব সত্যি, ঠাট্টা নয়;
তোমায় ঘৃণা করি, ভালবাসি হেলেনা-কে।
হার্মিয়া। কি সর্বনাশ! তুই যাদুকরী, তুই ফলের পোকা,
তুই মনচোর! রাত্তিরে লুকিয়ে এসে
আমার স্বামীর হৃদয় চুরি করেছিস!!
হেলেনা। বাঃ, মুখে আগল নেই একেবারে!
লজ্জা করে না? তুই না মেয়ে? ঘোমটার বালাই নেই?
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার মুখ থেকে গরম জবাব বার করবি?
যা, যা! ধাপ্পাবাজ কোথাকার! বেঁটে বক্কেশ্বর!
হার্মিয়া। বেঁটে! তাই তো! এতক্ষণে ধরেছি খেলা!
নিজে লম্বা কিনা, তাই দুজনের দৈর্ঘ তুলনা করে,
নিজের দীর্ঘাকৃতি জাহির ক'রে মেলে ধরে,
লাইস্যাণ্ডারকে ভুলিয়েছে। তুই উট্‌কোরকম লম্বা বলে
ওর উচ্চ ধারণা হবে? আর আমি
মাথায় ছোট বলে ওর চোখে ছোটলোক? কিসে ছোটো আমি,
রং মাখা ঢ্যাঙা বাঁশ কোথাকার? কিসে ছোট আমি, বল্!
ভেবেছিস এত বেঁটে, যে খামচে তোকে কাণা করে দিতে
নাগাল পাবো না?
হেলেনা। ভদ্রমহোদয়গণ, মিনতি করছি,
যদিও আমায় করেন ঘৃণা, ওর হাত থেকে বাঁচান।
ওর মতো আমি অসভ্য নই; দজ্জাল হয়ে উঠতে পারি নি;
আর দশটা মেয়ের মতই আমার কাপুরুষতা।
ওকে আটকান! ভাবছেন কি আমার চেয়ে মাথায় খাটো বলে
ওর গায়ের জোর কম?
হার্মিয়া। মাথায় খাটো! আবার বলেছে।
হেলেনা। হার্মিয়া, আমার সংগে চটাচটি করিস নি।
বন্ধুত্বের মান রেখেছি; কখনো দিইনি আঘাত;
তোকে আমি ভালবাসি, হার্মিয়া! চিরদিন বেসেছি!
শুধু একবার ছাড়া; ডিমিট্রিয়াস-এর মন পেতে
তোর এই বনে পালিয়ে আসার কাহিনী
বলে দিয়েছিলাম; তাও সে-ও এলো ছুটে,
আর আমিও এলাম পেছনে; কিন্তু সে আমায় গাল দিয়েছে,
বলেছে মারবে, গায়ে থুতু দেবে, খুন করবে;
এখন মানে মানে যেতে দে ভাই,
মনের দুঃখ মনে পুরে ফিরে যাবো এথেন্‌স্-এ
আর আসবোনা তোদের জ্বালাতে; যেতে দে;

দেখেছিস আমার মনটা কি নরম!

হার্মিয়া। যা না! কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে আটকে রেখেছে?

হেলেনা। আমারই মুগ্ধ হৃদয় রেখে যাচ্ছি এখানে।

হার্মিয়া। কার কাছে? লাইস্যান্ডার?

হেলেনা। না, না, ডিমিট্রিয়াস-এর কাছে।

লাইস্যান্ডার। ভয় নেই কোনো, হেলেনা, ওর সাধ্য কি তোমাকে ছোঁয়?

ডিমিট্রিয়াস। আমি রয়েছি সেটা দেখতে; আপনার ফোঁপর দালালি না করলেও চলবে!

হেলেনা। জানো না, খেপে গেলে ও ধৃত, ভীষণ;
পাঠশালায় ও ছিল সবচেয়ে দস্যি মেয়ে;
অমন বে'টেখাটো হলে কি হবে? ও হিংস্র ভয়ংকর।

হার্মিয়া। আবার বে'টেখাটো! থেকে থেকে বলে শুধু বে'টে আর খাটো!
প্রতি কথায় অপমান করছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছো?
ছেড়ে দাও, দেখে নিই একবার?

লাইস্যান্ডার। দূর হ' এখান থেকে, বামন অবতার!
পকেট সংস্করণ! পাকানো দাঁড়ির গোলগাল শিঁট!
রুদ্রাক্ষ! ট্যাপারি কোথাকার!

ডিমিট্রিয়াস। যে তোমার সাহায্য পায়ে ঠেলছে,
তার জন্যে এমন তৎপরতা বড়ই দৃষ্টিকটু।
খবরদার, হেলেনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবে না!
তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যদি দেখি
হেলেনা-কে সামান্যতম গদগদভাব দেখাচ্ছো,
তবে বুঝবে মজা!

লাইস্যান্ডার। বোঝাও না মজা, এবার তো কোনো বাধা নেই;
এস, সাহস থাকে তো চলে এস, দেখা যাবে
হেলেনায় কার অধিকার, তোমার না আমার!

ডিমিট্রিয়াস। আসবো বই কি! পয়িতারা কষে মুখোমুখি আসবো!

[লাইস্যান্ডার ও ডিমিট্রিয়াস-এর প্রস্থান]

হার্মিয়া। এই যে সব কান্ড দেখছেন, সব আপনার কীর্তি, দেবী!
একি। পিছু হটছেন কেন?

হেলেনা। তোমাকে বাবা বিশ্বাস নেই।
অমন রুদ্র মেয়ের আমি ত্রিসীমানায় নাই!
হাত তোমার আমার চাইতে আঁচড় কাটতে দড়;
আমার পা কিন্তু তোমার চাইতে লম্বা দিতে বড়! [প্রস্থান]

হার্মিয়া। অবাক কান্ড! দেখেশুনে বাক্য হরে' গেল! [প্রস্থান]

ওবেরন। তোর গাফিলতির চোটেই আজব ব্যাপার ঘটছে;
পর পর ভুল করেই চলবি? না, ইচ্ছে ক'রে করছিস?

পাক্। বিশ্বাস করুন আমায়, ছায়ার দেশের রাজা!

ভুল হয়ে গেছে বেজায় শহুরে পোষাক দেখে;
আপনিই তো বলেছিলেন পোষাক দেখে চিনতে!
তবে দোষ কোথায় দেখলেন আমার নিশীথ-অভিযানে?
শহুরে লোকের চোখেই তো দিয়েছি প্রেম-পুষ্পের রস!
আর সত্যি কথা বলতে কি ভালই হয়েছে প্রভু!
এমন উল্টোপাল্টা প্রেমের খেলা দেখবো আর কি কভু?

ওবেরন। দেখেছিস ঐ প্রেমিক-যুগল মাতবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে;
যারে রবিন টেনে দেরে মেঘের পর্দা ঊর্ধে;
যমালয়ের কৃষ্ণ কুয়াশায় ঢেকে দে দিগন্ত,
আবরিত হোক রে গগণ তারার রাজ্য অশান্ত।
ক্রুদ্ধ দুজন যোদ্ধাকে তুই পথ ভুলিয়ে নিয়ে যা দূরে,
পরস্পরের ত্রিসীমানায় আসতে যেন আর না পারে।
লাইস্যান্ডারের কণ্ঠস্বরের নিপুণ অনুকরণে
ডিমিট্রিয়াসকে খেপিয়ে তোল ক্রোধের বিস্ফোরণে!
আবার ডিমিট্রিয়াস-এর কণ্ঠস্বরে লাইস্যান্ডার হোক ক্রুদ্ধ,
এমনি ক'রে পাক খাইয়ে বন্ধ কর্ এ যুদ্ধ,
যতক্ষণ না মৃত্যুবেশী নিদ্রা নামে চোখের 'পরে,
ক্লান্ত পায়ে বাদুড়ের মতন কালো ডানায় ভর ক'রে;
তৎক্ষণাৎ লাইস্যান্ডারের চোখে এই শিকড় দিবি টিপে,
এর রসে আছে মহৎ গুণ দিলে হিসেব মেপে—
চোখের মায়া প্রেমের ঘোর, কাটে এরই স্পর্শে,
চোখে মণি আবার পাবে সহজ দৃষ্টি হর্ষে।
এই কাজল চোখে প'রে ঘুম ভাঙবে যখন,
এই ঘৃণাকে মনে হবে রাতের অলীক স্বপন।
এথেন্স্ অভিমুখে ফিরবে সুখী প্রেমিক-জুটি,
এই নূতন বাঁধন জীবনভোর আর যাবে না টুটি।
করিস কাজটা! ওদিকে বিষম প্রেমের ঘোরে ভরেছি রাণীর চিত্ত
এই সুযোগে ভুলিয়ে নেব ভারতবাসী ভৃত্য।
তারপরেতে রাণীর চোখেও দেব মুক্তি মন্ত্র;
আজব পশুর মায়া ভুলবে জগৎ হবে শান্ত।

পাক্। এসব কাজ, হে পরীরাজ, করতে হবে তাড়াতাড়ি
মেঘের পথে রাতের দানব চলছে ছুটে পৃথ্বী ছাড়ি;
অদূরে ঐ পূবের গায়ে ঊষাদেবীর দৌবারিক;
গোরস্থানে যাচ্ছে ফিরে ভূত-প্রেত সব আঁধার-শরিক
অপঘাতে মরেছে যারা বিদেশ বিভূঁই সাগরে
অভিশপ্ত আত্মা তাদের ফিরছে কীটের গহ্বরে।
ভয় ঢুকেছে প্রেতের রাজ্যে করলে দেরী পাছে
ধরা পড়ে ভয়াল রূপ দিনের আলোর কাছে।

আলোর হাসির সংগ থেকে স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন;
থমথমে কালো রাত্রির সাথে তাদের প্রণয় সম্ভাষণ।

ওবেরন। আমরা পরী, আমরা সুখী, আমরা অশরীরী,
ভোরের আলোর সংগে মোদের খেলা জগৎ জুড়ি;
বন থেকে বনান্তরে ছোটাছুটি বাঁধনমুক্ত
অগ্নিদীপ্ত পূবের তোরণ যাক না হয়ে উন্মুক্ত,
সাগরজলে ছড়াক আলো আনন্দেরই সুর ঢালি,
গাঢ় সবুজ নোনাজলে তরল সোনার অঞ্জলি
নির্ভয়ে তবু কাজ করে যা; হয়তো উষার আগে
কাজ সারা হবে; গা ঢেলে দেব অরুণাভার রাগে। [প্রস্থান]

পাক্। এধারে ওধারে, এধারে ওধারে,
ঘুরিয়ে মারবো চক্রাকারে;
আমার ভয়ে জগৎ কাঁপে;
এধারে ওধারে পরীর শাপে!
এই যে একজন!

[লাইস্যাণ্ডার-এর পুনঃপ্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। কোথায় তুমি উদ্ধত ডিমিট্রিয়াস? বলো তুমি কোথায়?

পাক্। এই যে শয়তান! তলোয়ার হাতে প্রস্তুত! তুমি কোথায় পালালে?

লাইস্যাণ্ডার। এই যে আসছি, সামলাও!

পাক্। এস আমার সংগে; সমতল ভূমিতে হবে লড়াই।

[কণ্ঠস্বর অনুসরণ-করতঃ লাইস্যাণ্ডার-এর প্রস্থান। ডিমিট্রিয়াস-এর পুনঃপ্রবেশ]

ডিমিট্রিয়াস। লাইস্যাণ্ডার! কোথায় তুই।
পলাতক, কাপুরুষ, শেষকালে রণে ভংগ দিলি?
কোথায় তুই? স্বোপঝাড়ে লুকিয়েছিস? গা-ঢাকা দিলি?

পাক্। কাপুরুষ, তারার পানে চেয়ে তুই করিস ভারী বড়াই!
স্বোপঝাড়ের সংগে তোর যত বীরের লড়াই!
আয় না দেখি আমার কাছে, দুষ্টু ছেলে মস্ত!
চাবকেই তোকে ঢিট করবো, দরকার নেই অস্ত্র!

ডিমিট্রিয়াস। তাই নাকি! আয় না কাছে! যুদ্ধ শুধু দম্ভে না।

পাক্। গলা শুনে আয়রে সংগে, হেথায় যুদ্ধ জমবে না!

[উভয়ের প্রস্থান। লাইস্যাণ্ডার-এর পুনঃপ্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। আগে আগে যাচ্ছে সে, কথায় করছে আস্ফালন;
গলা শুনে গিয়ে দেখি ব্যর্থ পদসঞ্চালন,
আমার চেয়ে হাল্কা পায়ে ভীরু শয়তান পালাচ্ছে;
যতই ছুটি ততই আরো দ্রুত সরে যাচ্ছে!
পথ হারিয়ে উঁচু নিচু হোঁচট খেয়ে অন্ধকারে
শ্রান্ত আমি এইখানেতে শোবো একটু হাঁফ ছেড়ে!

আসুক প্রভাত; ধূসর আলোয় হোক জগৎ দৃশ্যমান,
বার করবো শত্রু খুঁজে, শোধ দেব অপমান।

[নিদ্রা। পাক্ ও ডিমিট্রিয়াস-এর পুনঃপ্রবেশ]

পাক্। অহো হো কাপুরুষ! আসা হয় না কেন?

ডিমিট্রিয়াস। দাঁড়া যদি সাহস থাকে, কাণ্ড একি হেন?
দৌড়ে বেড়াস হেথায় হোথায় বুকের নেই পাটা;
মুখোমুখি দাঁড়াস না কেন? সাহসে আজ ভাঁটা?
কোথায় তুই?

পাক্। আয় না এখানে, এই যে আমি! আয় না!

ডিমিট্রিয়াস। দূর থেকে ঠাট্টা করছিস সহ্য আর হয় না!
দিনে দেখা হলে পিঠের চামড়া নেব খুলে;
যারে এখন যেথায় ইচ্ছা চোখ আসছে ঢুলে;
শীতল ভূমির শয্যা পরে চিৎপটাং হবো,
সকাল হলে পরে তবে তোকে দেখে নেব।

[শয়ন ও নিদ্রা। হেলেনা-র পুনঃপ্রবেশ]

হেলেনা। হে ক্লান্ত রাত্রি, হে দীর্ঘ, হে মন্থর,
খর্ব করো তোমার কাল, দ্বার খোলো পূব দিগন্তের,
ভোরের করুণধারায় যাবো সুদূর শুভ্র এসেন্‌স্ নগর;
ঘৃণার দহনে দগ্ধ হৃদয় শান্তি পাক অনন্তের।
দরবিগলিত দুঃখের নিদ্রা ছোঁয়ায় মায়াঞ্জন,
আপন থেকে আপনাকে কেড়ে ভোলাক শোকের রোমন্থন। [শয়ন ও নিদ্রা]

পাক্। এতক্ষণে তিনটে হোলো? আরেকটা নিখোঁজ যে!
জোড়ায় জোড়ায় চারটে হবে; এখনো এরা বেজোড় যে!
ঐ যে আসছে হারানিধি; দুঃখে বিপর্যস্ত;
কন্দর্পটা বেজায় দুষ্টু, রংগে সিদ্ধহস্ত,
বেচারী বিবি একশা হোলো, জব্দ জবরদস্ত!

হার্মিয়া। শ্রান্তি এমন আসেনি কখনো, আসেনি এমন দুঃখ,
তুষারশীতল শিশিরে স্নাত, কাঁটায় চরণ আহত;
সহ্য হয় না পথ-চলা আর হারিয়ে চলার লক্ষ্য;
হৃদয়ের যত আকুলতা সব স্খলিত চরণে ব্যাহত।
বিশ্রাম চাই নিদ্রা গভীরে প্রভাত অপেক্ষায়;
লাইস্যাণ্ডার অক্ষত থাক স্বর্গ-তিতিক্ষায়। [শয়ন ও নিদ্রা]

পাক্। ঘুমোও শুয়ে
শীতল ভুঁয়ে,
দেব চোখে
ওষুধ মেখে,
উপেক্ষিতার মান রেখে।

[লাইস্যাণ্ডার-এর চক্ষে রস লেপন]

জেগে উঠবি,
ভালবাসবি,
মাথার দিব্যি
হবি ভব্যি;
ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো!
লোকে বলে প্রবাদ জেনো,
জন্ম মৃত্যু বিয়ে
বিধাতাকে নিয়ে।
তুমিই বন্ধু দেখাবে
জেগে উঠেই মেড়াবে,
রাজপুত্তুর কন্যা পাবে;
নটে গাছটি মুড়িয়ে যাবে;
যে যার নিজের কনে নিয়ে ছাঁদনাতলা যাবে! [প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ।

লাইস্যান্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়া নিদ্রিত। পরীদল-সমভিব্যাহারে টিটানিয়া ও বটম্-এর প্রবেশ; পশ্চাতে অদৃশ্য ওবেরন।

টিটানিয়া। এসো প্রিয় বোসো হেথায় শুভ্র পুষ্পাসনে,
হাত বুলোই টোল-খাওয়া নরম তুলতুল গালে,
চকচকে ঐ মাথায় গুঁজি গোলাপ গুণে গুণে,
কুলোর মতন কানদুটিতে চুম্বন দিই ঢেলে।

বটম্। কুমড়োফুল কোথায়?

কুমড়োফুল। এই যে।

বটম্। আমার মাথাটা চুলকে দাও তো, কুমড়োফুল। উর্ণনাভ মশাই কোথায় গেলেন?

উর্ণনাভ। এই যে।

বটম্। উর্ণনাভ মশাই, মহাশয় উর্ণনাভ; অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে দুব্বা-র ডগায় বসা লাল-পেট মৌমাছি শিকার করে আনুন তো। অর্থাৎ, মশাই মৌমাছির মধুভরা পাকস্থলীটা চাই। খুব বেশী ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়বেন না যেন; আর সাবধান থাকবেন, পাকস্থলীটা যেন হঠাৎ ফেটে না যায়; হুজুর যে মধুর প্রপাতে হাবুডুবু খাবেন এটা আমার ভাল লাগবে না। সর্ষেগুঁড়ো মশাই কোথায়?

সর্ষেগুঁড়ো। এই যে।

বটম্। হাতখানা দেখি, সর্ষেগুঁড়ো মশাই! দূরে দাঁড়িয়ে সম্মানপ্রদর্শন না করে

কাছে আসুন দিকি।

সর্ষেগুঁড়ো। কি আদেশ?

বটম্। কিচ্ছু না মশাই, শুধু বীর কুমড়োফুলকে একটু চুলকোতে সাহায্য করুন তো। নাপিত ডাকতে হবে দেখছি, কারণ মনে হচ্ছে মুখে আশ্চর্য রকমের দাড়িগোঁফ গজিয়ে গেছে; এবং আমি গাধা এমনই নরম যে দাড়ি চিড়বিড় করলেই না চুলকে পারি না।

টিটানিয়া। প্রিয়তম শুনবে কোনো সংগীত-রাগিণী?

বটম্। হ্যাঁ, সংগীত-আদি ব্যাপারে আমার কাণ মোটামুটি ভালই তয়ের আছে। হোক, একটু ঢাকঢোল হোক।

টিটানিয়া। নইলে বলো কোন্ ব্যঞ্জন খেতে ইচ্ছে করো।

বটম্। ব্যঞ্জন? তা, কয়েক মুঠো বিচালি আনো তো। আবার মিহি করে কুচোনো ঘাস চিবোতেও ভাল লাগে। তার চেয়ে বোধহয় এক বাটি খড় খেতেই ইচ্ছে করছে; তাজা খড়, মিষ্টি খড়ের চেয়ে আর কি জিনিস আছে?

টিটানিয়া। আমার দলে আছে এক সাহসী পরী; আনবে সে কাঠবেড়ালির ভাণ্ডার ভেঙে কচি কচি বাদাম।

বটম্। না, না, তার চেয়ে শুকনো আমের আঁটি এক আধটা হোক না। যাক, তোমার দলবলকে বলে দাও আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে; একটু যেন নিদ্রার উদ্রেক অনুভব করছি।

টিটানিয়া। ঘুমোও তুমি, বাঁধবো তোমায় মৃণাল বাহুপাশে।
পরীরা সব যা রে দূরে, আর আসিস না ফিরে।
[পরীদের প্রস্থান]
এমনি করে মাধবীলতা, বল্লরী আর লজ্জাবতী,
এমনি ক'রেই বনের ব্রততী জড়িয়ে ধরে বটের বাহু।
অশেষ আমার ভালবাসা, তোমার তরে পাগল।
[উভয়ের নিদ্রা। পাক-এর প্রবেশ]

ওবেরণ। [অগ্রসর হইয়া] আয় রে রবিন, দেখছিস, কি অপূর্ব দৃশ্য!
পাগলামির এই অসংযমে এখন যেন দুঃখ হচ্ছে!
একটু আগে রাণীর দেখা পেয়েছিলাম বনে,
ঘৃণ্য এই নির্বোধের মন পেতে আকুল;
ধমকে উঠে বাধিয়ে দিলাম প্রচণ্ড কলহ।
দেখি কি এর লোমশ ভালে পরিয়েছে মুকুট,
সুগন্ধ ফুলের মালা গেঁথে।
আধফোটা সব মুকুলমাঝে যে শিশিরবিন্দু জ্বলে,
মাঝে মাঝে মুক্তোর মতন মসৃণ গোল শুভ্র,
তারাই এখন রূপসী ফুলের স্তব্ধ নয়নে
টলমল করে অশ্রু-সম ফুলের অপমানে।
আয়েস করে মজা করে করা গেল উপহাস,
জবাবে সে শুধুই করে মার্জনা ভিক্ষা,

কিন্তু অটল থাকে প্রেমে। সেই সুযোগে
ঝগড়ার মূল ছেলেটিকে চাইবামাত্র দিয়ে দিল,
এক পরীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমার কুঞ্জবনে।
ছেলেটিকে পেয়েছি যখন, এইবারেতে সন্ধি;
চক্ষু থেকে দূর করবো জঘন্য এই মায়াঘোর।
আর এথেনস্-এর এই গো-বেচারার মাথা ফিরিয়ে দে,
যাতে জেগে উঠে ফিরতে পারে সবার সাথে শহরে।
আজকে রাতের দুর্বিপাক ওর মনে থাকবে জেগে
শুধুমাত্র দুঃস্বপ্নের করাল স্মৃতি রূপে।
রাণীকে আগে মুক্তি দেয়া যাক।

[টিটানিয়া-র চক্ষুতে রস প্রদান]

যেমন ছিলে তেমনি হও;
দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হও;
চাঁদের শিকড় করবে ক্ষয়!
মদনফুলের পরাজয়!
টিটানিয়া! রাণী আমার! এবার জাগো, ওঠো!

টিটানিয়া। ওবেরণ! কি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন!
দেখলাম, আমি গাধার প্রেমে পড়েছি।

ওবেরণ। ঐ যে তোমার প্রেমাস্পদ।

টিটানিয়া। একি! সত্যি নাকি? ঘটলো কি করে?
ঈশ! ওকে দেখে এখন আমার গা রী রী করছে।

ওবেরণ। একটুখানি চুপ করো। রবিন, সরা গাধার মাথা।
টিটানিয়া, আদেশ করো, জাগুক গীত-মূর্ছনা;
ঘুমন্ত এই পশুমানব আরো গভীর ঘুমে লুটোক,
মৃত্যুসম বিস্মৃতিতে লুপ্ত হোক চেতনা।

টিটানিয়া। সংগীত হোক! নিদ্রার আরাধনা।

[সংগীত আরম্ভ ও শেষ]

পাক্। জেগে উঠে নিজের বোকাটে চোখেই ড্যাব ড্যাব করে তাকাস।

ওবেরণ। চলুক সংগীত! এস রাণী, দাও হাত হাতে,
নৃত্যছন্দে জাগাও দোলা এই ধরণীর বুকে।
পুনর্মিলন তোমার আমার আজকের দিন থেকে;
কালকে যাবে রাত্রি-নিশীথে আনন্দের বাণ ডেকে,
থিসিয়াস-এর গৃহে মোরা নাচবো জয়ের উৎসবে,
মুখরিত করবো গৃহ আশীর্বাদের সাম-রবে;
এরাও সেথায় জোড়ায় জোড়ায় বাহু বেঁধে হাজির হবে,
থিসিয়াস-এর সঙ্গে এরাও পরিণয়ের মন্ত্র নেবে।

পাক্। পরীর রাজা, ঐ শুনুন! খুব সাবধান!
কোকিল গাইছে ভোরের কুহুতান!

ওবেরণ। তবে এস রাণী আমার করুণ নিস্তব্ধতায়
রাত্রিছায়ার পেছনে দুটি অন্বেষণের মত্ততায়;
ভবঘুরে চাঁদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি
জগতের এক আঁধার-কোণ খুঁজে নিতে পারি।

টিটানিয়া। এস রাজা যেতে যেতে বলো দেখি আমাকে
কেমন করে আজকে রাতে পেলে খুঁজে আমাকে
মাটির পরে নিদ্রামগ্ন চারিদিকে মানুষ,
পরীর রাণীর হিয়ায় কেন এল হেন কলুষ।

[সকলের প্রস্থান। নেপথ্যে তূরীধ্বনি]

থিসিয়াস। যাও একজন, ডেকে আনো বনরক্ষককে।
পরিদর্শন, শেষ হয়েছে, উষা নবীন এখনো;
শুনবে প্রিয়া রুদ্রতাল শিকারী কুকুর-ডাক;
শিকল খুলে ছেড়ে দে ওদের পশ্চিমের ঐ উপত্যকায়;
যা রে ছুটে, বনরক্ষককে খবর দে! [জনৈক রক্ষীর প্রস্থান]
এস রাণী আমরা যাব ঐ শৈলের শিখরে,
শুনবে তুমি গর্জন আর প্রতিধ্বনির ঘূর্ণীঝড়,
এলোমেলো অসংগতির সুসংগীত মধুর স্বর।

হিপোলিটা। হয়েছিলাম বহু আগে হারকিউলিস-এর অতিথি,
দেখেছিলাম ক্রীট-দ্বীপে ভালুক-শিকার খেলা।
কুকুরগুলো স্পার্টা নগরীর। এমন আর শুনিনি কখনো
রণহুংকার আর গর্জন; সেই আশ্চর্য জয়গানে,
অরণ্য আর সুদূর আকাশ, ঝর্ণাধারা চারিপাশ
জমাট বেঁধে উঠলো হয়ে বিশাল এক ঝংকার।
বে-সুরের কি অপূর্ব সুর! কি কোমল সে বজ্রপাত!

থিসিয়াস। আমার কুকুরগুলোও সেই স্পার্টায় প্রতিপালিত,
তেমনি এদের মুখের গড়ন, তেমনি হলদ রং;
তেমনি দীর্ঘ কাণ নেড়ে এরা ঝাড়ে ভোরের শিশির;
তেমনি পেশল এদের গ্রীবা, তেমনি শক্ত পা;
গতি তেমনি মন্থর এদের; কণ্ঠে তেমনি বিষম জোর;
সুরেলা এমন চীৎকার কভু শোনেনি কোনো শিকারী,
না ক্রীট্-এ, না স্পার্টায়, না থেসালি।
শুনে নিজেই বুঝবে। একি? এ মেয়েরা কারা?

ইজিয়াস। প্রভু, এই আমার কন্যা হেথায় ঘুমিয়ে আছে;
এই যে লাইস্যান্ডার, আর এই ডিমিট্রিয়াস;
আর এই হেলেনা, নেডার-কন্যা হেলেনা;
সবাই এরা একসাথে হেথা জুটলো কেমন করে?

থিসিয়াস। ভোরে উঠে পালিয়ে এসেছে ঋতুর মহোৎসবে;
অপেক্ষা এদের আমাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে।

কিন্তু ইজিয়াস বলো আজই তো সেই দিন,
আজই তো হার্মিয়া তার চরম জবাব দেবে?

ইজিয়াস। এই সেই দিন, প্রভু।

থিসিয়াস। যাও, শিকারীদের আদেশ জানাও তূর্যধ্বনিতে ভাঙাক এদের ঘুম।

[নেপথ্যে তূর্য ও কোলাহল; লাইস্যাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়ার চমকিত হইয়া জাগরণ]

সুপ্রভাত, বন্ধুগণ। হয়েছে গত বসন্তকাল;
এত পরে কেন এই বাহার রাগে মিলন কূজন?

লাইস্যাণ্ডার। মাপ চাইছি, প্রভু।
উঠে দাঁড়াও তো সবাই।

থিসিয়াস। আমি জানতাম তোমরা দুজনে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী;
ধরায় আজকে জাগলো কেন মিলের ঐকতান?
হিংসাদ্বেষ কি বিদায় নিয়েছে? নইলে এমন শত্রু
পাশাপাশি কেমন করে নিদ্রা গেল ভাবি!

লাইস্যাণ্ডার। হে রাজন্, বিস্ময়ে অভিভূত নিজেই আমি, তবু বলছি;
তন্দ্রা লেগে রয়েছে এখনো জাগরিত চোখে;
সঠিক কিছুই বলতে পারি না কেমন করে এলাম হেথায়;
তবে মনে হচ্ছে—যদ্দূর ঠাহর হয়—হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে—
হার্মিয়া-র সঙ্গে আমি এসেছিলাম হেথায়;
ইচ্ছে ছিল যেখানে হোক এথেন্স্-এর বাইরে,
এথেন্স্-এর কুটিল আইনের সীমানা ছাড়িয়ে
বাঁধবো একটি ঘর।

ইজিয়াস। হয়েছে, হয়েছে, প্রভু যথেষ্ট হয়েছে:
আইন কোথা? আইন মেনে দিন মৃত্যুদণ্ড।
এরা পালাচ্ছিল ছলনা করে। শুনেছ, ডিমিট্রিয়াস,
পলায়নে তোমায় আমায় করতো পরাজিত;
তোমার যেত স্থাবর, আমার যেত পিতৃগর্ব,
কারণ গর্ব আমার, কন্যা দেব তোমার হাতে তুলে।

ডিমিট্রিয়াস। মহান অধিপতি, জানতে পেরে হেলেনারই মুখে
ওদের পলায়নের উদ্দেশ্য ক্রোধের জ্বালায় পিছু নিলাম আমি।
আর রূপবতী হেলেনা এল ভালবাসার টানে।
কিন্তু; হে রাজন, জানি না সে কি মন্ত্রশক্তি,
মন্ত্র ছাড়া কিই বা একে বলতে আমি পারি,
যার বলে হার্মিয়ার প্রতি ভালবাসা
এক নিমেষে গলে গেল তুষারকণার মতন;
সে প্রেম এখন স্মৃতির পটে শৈশবের খেলনা-সম;
মেতেছিলাম অবোধ খেলায়—এখন মূল্যহীন।
বুকে আমার যত ধর্ম, হৃদয়ে যত ব্যাকুলতা,
চোখে যত নির্ঝরিণী আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের,

সবাই এখন হেলেন-কে ঘিরে। হার্মিয়াকে দেখার আগে,
ও-ই ছিল বাকদত্তা আমার, জানেন আপনি প্রভু।
কিন্তু রোগগ্রস্ত মুখে তো আর মিষ্টিফল রোচে না!
তবে সে রোগ থেকে মুক্ত হয়েছি, স্বাস্থ্য আবার সমুজ্জ্বল।
এবার নেব মাথায় করে উপেক্ষিত প্রেমকে আবার;
অন্তরে রাখবো তাকে দেদীপ্যমান,
এ জীবনে আর কভু ফেলব না ধূলায়।

থিসিয়াস। শ্রেষ্ঠ প্রেমিক তোমরা দুজন, হয়েছে দেখা শুভক্ষণে!
ক্রমে ক্রমে শুনবো আরো এ কাহিনীর বিবর্তন।
ইজিয়াস করছি নাকচ তোমার আবেদন।
কারণ মন্দিরে আজ আমার সঙ্গে এই দম্পতিরা
ফুলডোরে ধরা দেবে চিরমিলন আশে।
তপন-উদয়ে ভোরের ধুসর পেয়েছে ক্ষয়, শিকার আজ থাক!
চলো যাই এথেন্স্-এ! তিন জোড়া দম্পতি
মাতবো ভোজে স্মরণ করে ভবিষ্যতের সংহতি।
এস, হিপোলিটা! [থিসিয়াস, হিপোলিটা ও অনুচরবর্গের প্রস্থান]

ডিমিট্রিয়াস। এসব ঘটনা যেন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র, সুদূর—
দিগ্‌বলয়ের পাহাড় হয়েছে স্তম্ভিত মেঘ।

হার্মিয়া। দ্বিধাগ্রস্ত চোখ যেন দ্বিধায় বিভক্ত,
জাগছে চোখে প্রতি দৃশ্যের দুই বিভিন্ন রূপ।

হেলেনা। আমারো তাই মনে হচ্ছে।
ডিমিট্রিয়াস-কে পেয়েছি কুড়িয়ে অরূপরতন-সম;
পেয়েছি, অথচ পাইনি যেন!

ডিমিট্রিয়াস। জেগে আছি কি?
হয়তো এখনো সুপ্তিমগ্ন, হয়তো দেখছি স্বপ্ন!
রাজা এসেছিলেন এক্ষুণি? ঠিক জানো, জানিয়েছেন আমন্ত্রণ?

হার্মিয়া। এসেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন পিতা।

হেলেনা। হিপোলিটা-ও ছিলেন।

লাইস্যাণ্ডার। মন্দিরে যেতে দিয়েছেন আমাদের আদেশ।

ডিমিট্রিয়াস। তবে তো জেগেই আছি! চলো যাই ও'র কাছে।
যেতে যেতে কথা হবে স্বপ্ন-সম্বন্ধে। [সকলের প্রস্থান]

বটম্। [জাগিয়া] আমার কিউ এলেই আমায় ডাকবে, উঠে পার্ট বলবো।
পরের ধরতাইটা হোলো, 'হে, জ্যোতির্ময় পিরামুস!' একি? পিটার
কুইন্স্! হাপরওয়ালা ফ্লুট! কামারের পো স্নাউট! স্টার্ভলিং!
দেখেছ? দেখেছ? লম্বা দিয়েছে আমাকে ফেলে! আমি একখানা
অসাধারণ স্বপ্ন দেখেছি, একটি অসম্ভব কল্পনা। সে স্বপ্ন যে কি স্বপ্ন
তা বলা কোনো মানুষের বুদ্ধিতে কুলোবে না! এ স্বপ্নের তাৎপর্য বলতে
যে মাথা কুটবে সে এক গাধা। দেখলাম আমি ইয়ে হয়েছি, কি যে হয়েছি

কি বলবে? দেখলাম আমি ইয়ে হয়েছি—দেখলাম আমার লম্বা দুটো ইয়ে—ইয়ে দুটো যে কি ইয়ে তা যে জানতে চাইবে সে আহাম্মক রঙচঙে ভাঁড়! মনুষ্যচক্ষু কখনো শোনেনি, মনুষ্যকর্ণ কখনো দেখেনি, মনুষ্যহস্ত কখনো চাটেনি, মনুষ্যজীব কখনো ভাবেনি, মনুষ্যহৃদয় কখনো ছোঁয়নি এমন গোলমেলে স্বপ্ন! পিটার কুইন্‌স্‌-কে বলবো এই স্বপ্নটা নিয়ে একটা তরজা লিখে ফেলতে। তরজার নাম হবে "পাছাপেড়ে স্বপ্ন," কারণ এর আগাও নেই, পাছাও নেই। নাটকের শেষে রাজার সামনে একদিন তরজাটা গাইতে হবে। পাছাপেড়ে যখন, তখন রাণীর মৃত্যু-উপলক্ষে কীর্তনের মতন করে গাওয়াটাই শোভন হবে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। এথেন্‌স্‌। কুইন্‌স্‌-এর গৃহ।

কুইন্‌স্‌, স্নাগ, বটম্‌, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রবেশ

কুইন্‌স্‌। বটম্‌-এর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলে? ঘরে ফেরেনি এখনো?
স্টার্ভলিং। কোনো খবর নেই। মনে হয় সে পাগল হয়ে বিবাগী হয়েছে।
ফ্লুট। যদি না আসে, তবে তো নাটকটার দফা রফা; কি বলো? অভিনয় তো করা যাবে না।
কুইন্‌স্‌। অসম্ভব। পুরো শহরে পিরাম্‌স-এর পার্ট করতে পারে এমন আর একটা লোক নেই।
ফ্লুট। সত্যি, মজুরদের মধ্যে অমন বুদ্ধিমান আর নেই।
কুইন্‌স্‌। ওর মতো ভাল লোকও আর নেই। আর গলা কি! যেন উপপতি মন্ত্র পড়ছে!
ফ্লুট। উপপতি নয়, উপাচার্য বলা উচিত; উপপতি মন্ত্র পড়বে কেন? উপপতি বড় বাজে মাল!

[স্নাগ্‌-এর প্রবেশ]

স্নাগ। শুনেছ? রাজা ফিরেছেন মন্দির থেকে; সঙ্গে আরো দু-তিনজন ভদ্রলোক ও মহিলা; এ'দেরও দল বেঁধে বিয়ে হয়ে গেছে। ঈশ, আজ যদি অভিনয়টা করতে পারতাম, তবে বকশিসের চোটে বাবু হয়ে বসতাম!
ফ্লুট। হায়রে বন্ধু বটম্‌ গুন্ডা! তুই এ জীবনে কি হারালি! একদিনে চার আনা কড়কড়ে পয়সা পেতিস; পায়ে ঠেললি? চার আনা সে পেতই; পিরাম্‌স-এর পার্ট দেখে রাজা চার আনা পয়সা দিতেন না? এ কখনো বিশ্বাস হয়? এত ভাল করছিল পার্টটা! চার আনা বকশিস পেতই! পিরাম্‌স-এর পার্টে দিন চার আনা রোজগার; এমন কি আর বেশি বলেছি?

[বটম্‌-এর প্রবেশ]

বটম্‌। ছেলেগুলো গেল কোথায়? দিলদরিয়ারা গেল কোথায়?
কুইন্‌স্‌। বটম্‌! আজ কি সুখের দিন!
বটম্‌। বন্ধুগণ আশ্চর্য সব ঘটনা বিধৃত করতে পারি; জানতে চেয়ো না; যদি

বলি তবে আমি নেহাৎ চাষা! তবে পরে বলবো, সব বলবো, ঠিক যেমন ঘটেছিল।

কুইন্‌স্‌। বলো, সব বলো, বটম্‌!
বটম্‌। আজ একটি কথাও নয়। এটুকু বলতে পারি, রাজার ভোজসভা শেষ হয়েছে। পোশাক টোশাক গুছিয়ে নাও; দাড়িগুলোয় লাগাও নতুন সুতো; জুতোয় বাঁধো বাহারে ফিতে; একটু পরে রাজবাড়িতে এসে হাজির হয়ো সবাই; পার্টটার্ট দেখে রেখো প্রত্যেকে; কারণ মোটমাট আমাদের নাটক নির্বাচিত হয়েছে। আর যাই করো বাবা থিস্‌বি-র জামাকাপড় যেন পরিষ্কার হয়; আর সিংহের পার্ট যে করবে সে যেন নখ না কাটে, ওগুলোই থাবার মতন বেরিয়ে থাকবে। আর, ভাইসব, আজকে পেঁয়াজ-রসুন খেও না কেউ, দোহাই তোমাদের। মুখ থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরুলে তবে ভদ্রলোকেরা বলবেন, 'বাঃ, বেশ মিষ্টি নাটক!' আর কথা নয়, বেরোও সব, যাও এখান থেকে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এথেন্‌স্‌। থিসিয়াস-এর প্রাসাদ।

থিসিয়াস, হিপোলিটা, ফিলোস্ট্রাটে, সম্ভ্রান্ত অতিথিবর্গ এবং অনুচরদিগের প্রবেশ

হিপোলিটা। ওরা যা বলছে থিসিয়াস সে তো বড়ই আশ্চর্য!
থিসিয়াস। আশ্চর্য কিন্তু অসম্ভব; হয় না আমার বিশ্বাস
পৌরাণিক কিংবদন্তী আর রূপকথার পরীর গল্প।
প্রেমিক আর উন্মাদের উদ্ভ্রান্ত কল্পনায়
উদ্ভট আর অবাস্তব নিত্য উৎসারিত,
বিবেচনা, বুদ্ধিসীমা অট্টহাস্যে লঙ্ঘিত।
পাগল, প্রেমিক আর কবি—
মনোলোকের বৈচিত্র্যে তিনজনই সমান।
একজনের চোখে ভাসে লক্ষ প্রেত নারকী,
তাকেই বলি পাগল; প্রেমিক তেমনি আকুলতায়
কৃষ্ণকলি মেয়ের মুখে দেখে অতুল রূপ;
কবির চোখও সূক্ষ্মে কি এক উন্মাদনায়
ছুটে বেড়ায় জগৎ থেকে আকাশ, আকাশ থেকে জগতে,
খুঁজে বেড়ায় পরশমাণিক, অন্তরের কল্পরূপ;
মনে মনে অসম্ভবের মূর্তি গড়ে, তারপর নেয় কলম;
লেখারেখায় সেই মূরতি আঁকে; যা ছিল নিঃসীম শূন্য,
তাকেই দেয় গৃহের সীমা; আনে তাকে কাছাকাছি;
নতুন নামের পরিসরে বাঁধে তাকে আদর করে।

মানব-মনের কি বিচিত্র খেলা; আনন্দের পরশ পেলেই
খুঁজে বেড়ায় খেয়ালিপনায় চিরানন্দের উৎসলোক।
তেমনি আবার রাতের আঁধারে মনে যদি ভয় ঢোকে,
ঝোপঝাড়কে ভালুক ভেবে পালায় ছুটে কত লোকে!

হিপোলিটা। কিন্তু কাল রাতের কাহিনী বার বার শুনে,
চারজনেরই একই ভাষণ সাড়া জাগায় প্রাণে;
শুধুমাত্র কল্পনায় কি এ ঘটনা সম্ভব?
হোক না কেন আশ্চর্য, হোক না কেন বিস্ময়কর
পরস্পরের কথাই এদের সততার সাক্ষী।

থিসিয়াস। এই যে আসছে প্রেমিকরা, আনন্দে মুখর!
[লাইসাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হার্মিয়া ও হেলেনা-র প্রবেশ]
সুখী হও, বন্ধুগণ, হিয়ায় জাগুক নিতি নিতি
নতুন প্রেমের সাড়া।

লাইস্যাণ্ডার। তেমনি জাগুক প্রভুর গৃহে, উদ্যানে, শয্যায়!
এস এবার : কি নাচ হবে, মুখোস নাচ?
ফুলশয্যার, এখনো তিন ঘণ্টা বাকি;
এই সুদীর্ঘ যুগ অতিবাহিত করবো কেমন করে?
কোথায় গেল বিদূষক, রাজসভার আমোদকর্তা?
আমোদপ্রমোদ হবে কি আজ? নাটক নেই কিছু?
লাঘব করবো কি উপায়ে প্রতীক্ষার এই যন্ত্রণা?
ফিলোস্ট্রাটে-কে ডাকো।

ফিলোস্ট্রাটে। এই যে এক নির্ঘণ্ট; সব ব্যবস্থার তালিকা;
দেখুন স্বয়ং হুজুর কোন্‌টা প্রথম শুনতে চান। [লিপি প্রদান]

থিসিয়াস। [পড়িয়া] 'সেণ্টর বাহিনীর যুদ্ধের পালাগান'
শিল্পী : এক এথিনীয় খোজা, তার-যন্ত্রে পটু।
না, এ চলবে না; গল্পটা পুরো বলেছি প্রিয়াকে
আত্মীয় আমার হারকিউলিস-এর সম্মানার্থে।
'মত্ত ব্যাকানালদের নৃত্য এবং অরফিয়ুস-হত্যা';
এ তো বহু পুরোনো নাটক; থীব্‌স্ থেকে ফিরলাম যখন
দিগ্বিজয় সেরে; এ নাটকই তো দেখেছিলাম।
'দরিদ্রদশায় শিক্ষার মৃত্যুতে বাক্‌দেবীর শোক';
এটা বোধহয় ব্যঙ্গনাট্য, ক্ষুরধার এর শ্লেষ;
অত্যন্ত বে-মানান বিবাহ উৎসবে।
'পিরামুস এবং থিসবি-র প্রেমোপাখ্যান
অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক ক্লান্তিকর নাটিকা; অতি করুণ হাস্যরস।'
করুণ অথচ হাস্যরস, ক্ষুদ্র অথচ ক্লান্তিকর!
এ যে দেখছি গরম বরফ, অতি আশ্চর্য তুষার।
এই অসংগতির সংগতিটা কেমন হবে জানো?

ফিলোস্ট্রাটে। নাটক এটা হুজুর মালিক গুটি দশেক কথার;
সত্যি এটা ক্ষুদ্র নাটক, ক্ষুদ্রতর দেখিনি।
আবার দশটা কথাও না থাকলেই হোতো যেন ভাল;
তাই ক্লান্তিকর। আগাগোড়া একটা কথার নেই সামঞ্জস্য;
নেই কোনো কাণ্ডজ্ঞান একটা অভিনেতার;
আর করুণ তো বটেই প্রভু, পিরামুস যে আত্মঘাতী;
মহড়া দেখতে বসে চোখের জলে ভেসে গেলাম;
এমন উচ্চ হাসির অশ্রুপাত করেনি কেউ কভু।

থিসিয়াস। অভিনয় করছে কারা?

ফিলোস্ট্রাটে। কড়া হাতের মেহনতি মানুষ এরা এথেন্‌স্-এর;
মাথা খাটিয়ে কাজ বোধহয় জীবনে এই প্রথম।
অনভ্যস্ত স্মৃতির পরে চাপিয়েছে বিষম বোঝা;
প্রাণপণে নাটক করবে হুজুরের বিবাহে।

থিসিয়াস। তবে শুনবো এ নাটক।

ফিলোস্ট্রাটে। না, না, মহান রাজা!
হুজুরের অযোগ্য; শুনেছি বারবার; বাজে জিনিস,
একেবারে বাজে! উদ্দেশ্যটা মহৎ ছিল; হুজুরের সেবা;
তবে প্রচণ্ড চেষ্টা আর প্রাণান্ত মুখস্থে
সে উদ্দেশ্য বেঁকেচুরে বিকটরূপ ধরেছে;
হাসতে যদি চান হুজুর শুনুন এই নাটক।

থিসিয়াস। শুনবো এই নাটক;
ওদের সারল্য আর শ্রদ্ধা মিশে অপূর্ণতা পূর্ণ হবে!
যাও, নিয়ে এস ওদের; মহিলাগণ, আসন নিন। [ফিলোস্ট্রাটের প্রস্থান]

হিপোলিটা। মুখতার ধনতাধনস্তি ভাল লাগবে না আমার;
রাজসেবার ঠেলায় এমন নিজের গলা কাটা, এ কি ভাল?

থিসিয়াস। কি বলছ প্রিয়তমা? অত খারাপ হবে না।

হিপোলিটা। ফিলোস্ট্রাটে বলে গেল অক্ষম ওরা অতিশয়।

থিসিয়াস। সেই অক্ষমতার অর্ঘ্য নেব কৃতজ্ঞ চিত্তে।
ওদের যেটা শূন্যতা সেটাই হবে পূর্ণতা আমাদের মনে।
রাজসেবায় হয়তো ওদের প্রমাদ অনেক থাকবে;
রাজার কাছে প্রয়াস বড়ো, প্রতিভার চেয়ে।
যেখানে গেছি শুনেছি অনেক স্বাগত-বক্তৃতা;
বহুযত্নে রচনা আর বহুকষ্টে মুখস্থ;
দেখেছি তাদের বিবর্ণ মুখ, কেঁপেছে হঠাৎ ভয়ে,
কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে বক্তৃতার মাঝেই;
আয়াসলব্ধ কথার তোড়ের কণ্ঠ রুদ্ধ ত্রাসে;
শেষ পর্যন্ত মূক হয়ে পালিয়েছে ছুটে,
স্বাগতম আর হয়নি বলা। তবু প্রিয়া

অনন্ত সেই কথার মাঝেই পেয়েছি খুঁজে স্বাগতম;
সন্ত্রস্ত লাজুক যত রাজ-সম্ভাষণ,
কম নয় সে সপ্রতিভ বাগ্মিতা থেকে
না-বলার অন্তরালে বলে আমার কাছে
ভালোবাসার জীভ-জড়ানো সারল্য যার আছে।

[ফিলোস্ট্রোটের পুনঃ প্রবেশ]

ফিলোস্ট্রোটে। হুজুরের আজ্ঞা হোক, এবার গৌরচন্দ্রিকা হবে আরম্ভ!

থিসিয়াস। আরম্ভ হোক!

[তূর্যধ্বনি। সূত্রধারবেশে কুইন্‌স্‌-এর প্রবেশ]

সূত্রধার। যদি করি অপমান দর্শকবৃন্দে ইচ্ছাক্রমে সে অপমান।
স্বপ্নেও দিবেন না স্থান করাই মোদের উদ্দেশ্য,
ইচ্ছা করি শুধু। প্রদর্শিতে মোদের সরল সহজ নাট্যমান
ইহাই মোদের কাল হইল, বৈধব্যের হবিষ্য!
মনে করুন আপনারা অতি অভাজন। মোরা আসিনু হেথা অতীব ঘৃণায়।
আসি নাই মোরা তুষিতে সমাগতজনে
সত্য মোদের অভীষ্ট। সকলের মনের বাসনা পুরাতে কাণায় কাণায়;
আসি নাই হেথা। যেন জ্বলেন তৈলে ও বেগুনে,
নটগণ আসিছে হোথা! উহাদেরি অভিনয়
যাহা কিছু জানিবার আছে সবই জানায়!

থিসিয়াস। লোকটার কথায় দাঁড়ি-কমা'র কোনো বালাই নেই!

লাইস্যাণ্ডার। ওর বক্তৃতার তুলনা শুধু পাজী ঘোড়া! ছন্দহীন তালহীন লাফালাফি! একটা নীতিবাক্য শেখা গেল, প্রভু; শুধু বলিলে চলে না; থামিতেও জানা চাই।

হিপোলিটা। সত্যি, শিশুর হাতে ভেঁপুর মতন দিয়ে গেল বক্তৃতাটা; শব্দ আছে শব্দটা আয়ত্তে নেই।

থিসিয়াস। হ্যাঁ, যেন জট পাকানো দড়ি। ছেঁড়েনি কোথাও, তবে এমন তালগোল পাকিয়েছে যে দড়ি বলে চেনা যায় না।

[পিরামুস, থিসবি, প্রাচীর, চাঁদমামা ও সিংহের প্রবেশ]

সূত্রধার। ভদ্রমণ্ডলী সবে কি হয়েছ বিস্মিত এই মিছিল দেখি?
বিস্ময়ের ঘোর কাটিবে শীঘ্র সত্যের দীপ্ত আলোকে
ঔৎসুক্য নিবারণ তরে বলি, এই ব্যক্তি পিরামুস বই কি;
আর এই অপ্সরা বিনিন্দিতা মহিলা থিসবি হেথা ঝলকে!
এই যে ব্যক্তি বক্ষে-পৃষ্ঠে চূণ-শুরকি বহে অকাতরে,
এ-ই হইল প্রাচীর অলঙ্ঘ্য, প্রেমের বাধাস্বরূপ;
ইহারই গাত্রে ছিদ্র পথে দুর্ভাগা প্রেমিক আলাপ করে;
নাট্যমধ্যে ইহারে দেখিয়া বিস্ময় না মানিও অপরূপ!
এই যে ব্যক্তি হস্তে ধরিছে প্রদীপ, কুত্তা, ফণীমনসা,
ইনিই চন্দ্রদেব সর্বোপাস্য, চাঁদমামা লোকে কহে যাঁহারে;

কেন না চন্দ্রালোকে প্রেমিক-প্রেমিকা আলাপনে হারাইবে দিশা,
নিনুর সমাধি-পার্শ্বে তাহারা হস্তধৃতাধৃতি করে।
এই জন্তু ভয়ংকর, সিংহ নামেতে বিদিত;
প্রেমিকা থিসবি প্রথমে পঁহুছিতে,
ঘাবড়াইল সিংহ হেরি আচম্বিতে,
পলাইতে গিয়া শালটি তাহার ধূলায় গেল গড়াগড়ি
সিংহ অমনি ভীষণ কামড়ি' শাল করিল রক্তাক্ত।
ক্ষণপরে তপন-সম উদিলেন পিরামুস নরহরি;
দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তমার শাল সিংহনখরে নিহত!
অমনি ভাতিল তরবার তাঁহার, বুভুক্ষু ভয়াল ভল্ল
নিমেষে ভীষণ ভুজংগপ্রয়াতে ভক্ষিল ভল্ল বক্ষ!
থিসবি আছিল তুঁতগাছে গুপ্ত, হেরি এই জীবনমল্ল
প্রিয়ের ভল্ল টানিয়া কল্ল আত্মহত্যা মোক্ষ।
আর যাহা আছে নাট্যরংগ, সিংহ, চন্দ্র, প্রাচীর, প্রেমিক
সকলে মিলিয়া করিবে খোলসা সাঙ্গ হইল মাংগলিক।

[অভিনেতৃবর্গের প্রস্থান]

থিসিয়াস। ভাবছি সিংহও কথা বলবে নাকি।

ডিমিট্রিয়াস। আশ্চর্য কি প্রভু? এত গাধা কথা বলছে, আর একটা সিংহ বলতে পারবে না?
স্নাউট এই নাটকে আছে এমন ঘটনা সুচির;
যে স্নাউট আমি দাঁড়ায়ে আছি সাজিয়ে প্রাচীর!
এমন দেওয়াল আমি শুন ভদ্রমণ্ডলী;
আছে দেহে ছিদ্র এক, ফুটো কহে কোন্দলী;
এই ছিদ্রপথে করে পিরামুস ও থিসবি
গুজগুজ ফুসফুস যথা বায়স-বায়সী।
এই মৃত্তিকা, এই শুরকি চূণ, এই ইষ্টকখণ্ড!
প্রমাণ করে আমিই সেই দেওয়াল দোর্দণ্ড!
সত্য শুনো ভদ্রজনে এই সেই ছিদ্র,
এই ফুটোয় নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ রুদ্র।

থিসিয়াস। ইঁট-পাথর এর চেয়ে ভালো বলতে পারে কখনো?

ডিমিট্রিয়াস। এমন সদালাপি শুরকি জীবনে দেখিনি প্রভু।

থিসিয়াস। পিরামুস এগিয়ে আসছে দেয়ালের কাছে! চুপ!

[পিরামুস-এর পুনঃ প্রবেশ]

পিরামুস। হে ভয়ংকর রাত্রি! হে মসীবিনিন্দ্য রাত্রি।
হে পলাতক দিবসের সিংহাসনলোভী!
হে রাত্রি! হে রাত্রি! হায় হায় হায় ধরিত্রী!
থিস্‌বি ভুলেছে প্রতিজ্ঞা তাহার জাগিছে চিত্তে ক্ষোভ-ই।
আর তুই হে প্রাচীর; হে সুমিষ্ট, হে সুন্দর!

হে প্রাচীর, সুমিষ্ট প্রাচীর, ওহে আমার সুন্দর!
তাহার বাপের আমার বাপের গৃহের মাঝে কি করিস!
দেখা দেখি ছিদ্র তোর নহিলে পরাণ সংহারিস!
[প্রাচীরের অঙ্গুলি উত্তোলন]
ধন্যবাদ হে ভদ্র প্রাচীর; ইন্দ্র পরিষ্কৃবেন তব শ্যাওলা!
রে দুষ্ট প্রাচীর! তব ছিদ্রে না হেরি স্বর্গ, এ কি নিয়তির খেওলা!
একি দেখাইলি? নাহি হেরি থিস্‌বি ফুল্লকমলবদন!
অভিশপ্ত তোমার গতর ধ্বংসুক তব ইষ্টক গাঁথন!

থিসিয়াস। দেয়াল যা জ্যান্তো, ও উল্টে শাপ দেবে।

পিরামুস। না, না, হুজুর, বইতে ওরকম নেই। "ইষ্টক গাঁথন" হোলো থিস্‌বি-র কিউ; থিস্‌বি-র ঢোকার সময় হয়েছে! তখন এই ফুটো দিয়ে আমি তাকে দেখতে পাবো। দেখবেন, সব দেখবেন, যেমন বলছি ঠিক তেমন ঘটবে। ঐ যে আসছে!

[থিসবি-র পুনঃপ্রবেশ]

থিস্‌বি। হে প্রাচীর, বহুবার তুমি শুনিয়াছ মম বিলাপ আকুলিবিকুলি!
নির্দয় তুমি রচিয়াছ ব্যবধান প্রেমিক আর মম মাঝে;
দাড়িম্ব ওষ্ঠযুগল মম করে ইষ্টক-সনে কেলি;
তব প্রস্তর-দেউল নির্মম হয়ে স্পর্ধিত হয়ে রাজে।

পিরামুস। এ কার কণ্ঠস্বর দেখি! ছিদ্রে আঁটিব চক্ষু,
দেখিব প্রিয়ার মুখ শুনি কি না শুনি!
থিস্‌বি।

থিস্‌বি। তুমি মোর প্রিয়তম, তোমারই তরে দিন গুণি!

পিরামুস। দিন গুণিয়া হইবে কি? আমি কামোন্মত্ত;
কন্দর্প চেপেছে কন্ধে, তেমনই অনুরক্ত!

থিস্‌বি। রতি-র মতই রহিব আমি, ভাগ্য বড়ই শক্ত!

পিরামুস। সূর্যদেবের মতই আমি কুন্তীদেবীর ভক্ত!

থিস্‌বি। কুন্তীদেবীর মতই আমি সূর্যদেবে যুক্ত!

পিরামুস। এই পাপিষ্ঠের ছিদ্রপথে করহ মোরে চুম্বন!

থিস্‌বি। চুম্বি শুধুই প্রাচীর-ছিদ্র, ওষ্ঠ করহ লম্বন!

পিরামুস। থাক, হয়েছে! আসিবে কি তুমি বিদ্যুৎগতি নিনুর কবর পাশে?

থিস্‌বি। জীবনমৃত্যু সাক্ষী আমার যাইব মিলন আশে!

[পিরামুস ও থিসবি-র প্রস্থান]

প্রাচীর। প্রাচীরর পার্ট হেথায় সাংগ হইল,
তাই প্রাচীর এবার অনাত্ত চলিল! [প্রস্থান]

থিসিয়াস। একি! দুই পরিবারের মধ্যেকার চীনের প্রাচীর চলে গেল যে!

ডিমিট্রিয়াস। কি আর করা যাবে প্রভু? দেয়াল যদি আচমকা কথাবার্তা বন্ধতে শুনতে শুরু করে তবে ওকে ধরে রাখা যায় কি করে?

হিপোলিটা। এমন বাজে মাল জীবনে শুনিনি।

থিসিয়াস। শ্রেষ্ঠ যে নাটক সে-ও তো জীবনের ছায়া মাত্র। নিকৃষ্টকেও শ্রেষ্ঠ করা যায় কল্পনার রং-এ রাঙিয়ে!

হিপোলিটা। কার কল্পনা? অভিনেতা, না দর্শক? এ ক্ষেত্রে দেখছি দর্শকের কল্পনা ছাড়া গতি নেই, কারণ অভিনেতাদের ও বস্তুটি নেই।

থিসিয়াস। নিজেদের ওরা নিকৃষ্ট মনে করে; প্রতিদানে সেই বিনয়ের অসম্মান করলে তার চেয়েও ওদের ছোট করা হবে। সে অপমান না করে দেখ—ওরা সরল, মহৎ মানুষ। এই যে আসছে দুই মহৎ পশু, একজন সিংহ, আরেকজন মানুষ।

[সিংহ ও চাঁদমামার পুনঃপ্রবেশ]

সিংহ। মহিলাবৃন্দ! আপনাদিগের হৃদয় বড় কম্পিত, হে সুন্দরি
ভীত সে হর্মাতলে হেরি ক্ষুদ্র ছুছুন্দরী!
এক্ষণে সে হৃদয়ে বাজে ত্রাসের শম্ভু ডম্বরু,
কারণ জলজ্যান্ত সিংহ হেথায় লাগায় লম্ফঝম্পরু!
তাই ঘোষি পূর্বাহ্নে আমি স্নাগ নামে মিস্তরি!
নহি আমি সিংহ সত্য, নহি সিংহের ইস্তরি।
সিংহের শুধু চামড়া-মোড়া; হইয়া সত্য হিংস্র সিংহ
আসিতাম যদি হইত পাপ, হইত রসভংগ।

থিসিয়াস। বাঃ কি ভদ্র জন্তু! সিংহেরও বিবেকটিবেক থাকে তাহলে!

ডিমিট্রিয়াস। আজ পর্যন্ত এমন শান্তশিষ্ট পশু দেখিনি!

লাইস্যাণ্ডার। এই সিংহ দেখছি বীরত্বে শৃগাল।

থিসিয়াস। হ্যাঁ, আর জ্ঞানগম্যিতে পরমহংস!

ডিমিট্রিয়াস। উপমাটা ঠিক হোলো না প্রভু; শৃগাল সুযোগ পেলেই হংস ধরে অবলীলা-ক্রমে বয়ে নিয়ে যায়। এর বীরত্ব তো কই জ্ঞানগম্যির ভার বইতে পারছে না।

থিসিয়াস। আবার জ্ঞানগম্যিও ঠিক বীরত্বকে উস্কে দিতে পারছে না; শৃগাল হংসে যে আদা-কাঁচকলায়। যাক্ উপমা বাদ দাও; ওর জ্ঞানগম্যির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। এবার চাঁদ কি বলে শুনি।

চাঁদমামা। এই হের' লণ্ঠন—ষোলোকলা চন্দ্র—

ডিমিট্রিয়াস। কলাগুলো নিজেই খাওনা!

থিসিয়াস। খেয়েছে খেয়েছে, কলা খেয়েছে খানিকটা। পূর্ণশশীকলার খানিকটা এখনও অদৃশ্য হয়ে আছে; ও খেয়েছে সেটুকু।

চাঁদমামা। এই হের' লণ্ঠন ষোলোকলা চন্দ্র,
এ দাস যেন চাঁদমামা চন্দ্রলোকে বন্ধ।

থিসিয়াস। এ হে হে, বিসমিল্লায় গলদ! চন্দ্রলোকে বন্ধ যদি তবে লণ্ঠনের মধ্যে ঢুকুক; নইলে চাঁদমামা বলে মানবো কেন?

ডিমিট্রিয়াস। ভেতরের জ্বলন্ত সলতেটার ভয়ে কাছে ঘেঁষছে না। দেখছেন না? সলতের অনল একেবারে কোপানল হয়ে দাউ দাউ করছে।

হিপোলিটা। এ চাঁদ আমার লাভ লাগছে না! অমাবস্যা হয় না কেন?

থিসিয়াস। ওর জ্ঞানালোকের স্বল্পতা দেখে অনুমান করছি কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে;

তবু ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে অপেক্ষা করাই উচিত।

লাইস্যাণ্ডার। বলো, চাঁদমামা।

চাঁদমামা। বলতে চাই এইটুকু, এই লণ্ঠনটা চাঁদ; আমি চাঁদমামা; এই মনসাকাঁটা, চাঁদের কলংক; এই কুত্তা আমার বাহন।

ডিমিট্রিয়াস। দেখ, এ সবই তো তাহলে লণ্ঠনের মধ্যে থাকবে বাইরে কেন? এই, চুপ, থিস্‌বি আসছে।

[থিসবি-র প্রবেশ]

থিস্‌বি। এই হেথা সমাধি নিন্‌-র, কোথা মোর প্রিয়?

সিংহ। [গর্জন করিয়া] হাল্‌ম!

[থিস্‌বি-র দ্রুত পলায়ন]

ডিমিট্রিয়াস। বাঃ সিংহ! কি গর্জন!

থিসিয়াস। বাঃ থিস্‌বি! কি ধাবন!

হিপোলিটা। বাঃ চাঁদ! কি জ্বলন! না সত্যি, এ চাঁদের আলোর বাহার আছে!

[সিংহ কর্তৃক থিস্‌বি-র শাল দলন ও প্রস্থান]

থিস্‌বি। বাঃ, সিংহের কি প্রতাপ! যেন ইঁদুর ধরছে!

ডিমিট্রিয়াস। তারপরই এল পিরামুস!

লাইস্যাণ্ডার। পিরামুস কি! সিংহের মামা ভোম্বলদাস! তাই তো সিংহ হাওয়া!

[পিরামুস-এর পুনঃপ্রবেশ]

পিরামুস। হে মধুর চন্দ্রমা, সূর্যালোকে প্লাবিছ জগৎ!
ধন্যবাদ প্রদানি তোমা, কিরণরাশির মূল্য নগদ!
তব করোজ্জ্বল জ্বলজ্বল সমুজ্জল কজ্জলে,
দেখিব প্রাণের থিসবিরে মম আর কয়েক মুহূর্ত গেলে।
কিন্তু তিষ্ঠ! এ কি ব্যাগেড়া!
এ কী দেখি আমি বেচারা!
একি দুঃখের ফাঁস!
নয়ন, দেখিছ কি?
হায় প্রিয়া প্রাণের হাঁস!
তব শাল মখমল
রক্তে যে ছলছল!
কোথা আছ যম ভয়ংকর?
লও মৃত্যু ত্বরা করি,
জীবনসূত্র ছিন্ন করি,
ভুঞ্জো, ঝঞ্জো, খঞ্জো, প্রভঞ্জো, প্রলয়ংকর!

থিসিয়াস। এই আবেগের সঙ্গে যদি বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ যোগ দেয়া যায়, তবে হয়তো খামচে খানিকটা চোখের জল বার করাও যেতে পারে।

হিপোলিটা। হতে পারে আমি দুর্বলচিত্ত, কিন্তু লোকটার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে!

পিরামুস। কি হেতু হে প্রকৃতি সৃজিলা সিংহশাবকে?
সেই সিংহ আজি ঝলসিল মম জীবনদীপ হিংসার পাবকে!

সেই জীবনদীপ, মম প্রিয়া, আছে—না, না, ছিল—মোর হৃদয় মধ্যে,
থাকিত, হাসিত, খেলিত, প্রেমিত, প্রত্যহ জীবনযুদ্ধে।
এস, অশ্রু, খাপাও মোরে;
এস অস্ত্র; আঘাতো সমরে,
পিরামুসের বক্ষ;
হ্যাঁ, এই বামদিকের বক্ষে
যাহা হৃৎপিণ্ড রক্ষে
[নিজবক্ষে অস্ত্রাঘাত]
এই মরিলাম, এই মরিলাম, এই হইলাম যক্ষ!
এখন আমি আকাট মৃত,
এখনো আমি অসংকৃত;
প্রাণপক্ষী উড়ছে ঐ আকাশে!
জিহ্বার জ্যোতি নিভিয়া গেল!
চন্দ্র ঐ ছুটিয়া পলাইল! [চাঁদমামার প্রস্থান]
গেল, গেল, সব গেল!
এবার মরিতেছি, মরিতেছি, মরিতেছি, মরিতেছি, মরিলাম! [মৃত্যু]

ডিমিট্রিয়াস। বালাই ষাট, মরবে কেন? মৃত্যুর উপর টেক্কা মারো!

লাইস্যাণ্ডার। টেক্কা দেবে কি করে ভাই? ও তো মরে গেছে। অন্যের তুরুপের পিঠে টেক্কা দিয়ে বসে আছে।

থিসিয়াস। ডাক্তার টাক্তার ডাকতে পারলে এখনো হয়তো বেঁচে উঠতে পারে; তারপর টেক্কা না হোক গাধা সেজে একা টানতে পারে।

হিপোলিটা। আচ্ছা, এটা কি হোলো? থিস্‌বি ফিরে এসে প্রেমিকের দেহ আবিষ্কার করার আগেই চাঁদ ভেগে পড়লো যে!

থিসিয়াস। তাহলে বোধহয় তারার আলোয় হবে। এই যে আসছে, এবং ওর অনুশোচনার সঙ্গেই নাটক শেষ।

[থিস্‌বির পুনঃপ্রবেশ]

হিপোলিটা। অমন একখানা পিরামুস-এর জন্যে খুব বেশি অনুশোচনা করাটা ভাল হবে কি? ছোট করে সারলেই বাঁচা যায়।

ডিমিট্রিয়াস। পিরামুস আর থিসবি-র মধ্যে অভিনেতা হিসেবে ফারাকটা ধুলে পরিমাণ। যদিও একজন পুরুষের পার্টে, আর একজন মেয়ের। হায় ভগবান! যেমন পুরুষের মতন পুরুষ, তেমনি পুরুষের মতন মেয়ে।

লাইস্যাণ্ডার। ঐ পদ্মনয়নের দৃষ্টি হেনে ইতিমধ্যে দেহটা দেখে ফেলেছে!

ডিমিট্রিয়াস। এবং ধর্মাবতারের এজলাসে অধীনের ফরিয়াদ এইবার শুরু হবে।

থিস্‌বি। ঘুমায়ে রয়েছ প্রিয়তম?
একি! মরেছ, পায়রা মম?
হে পিরামুস, ওঠো!
কথা কও, কথা কও! রয়েছ বোবা?
মরেছে, মরেছে, হারায়েছে শোভা!

চাপিয়াছে সমাধির মুঠো!
এই নিমীলিত কমল চক্ষু,
এই বিম্বাধরোষ্ঠ ইক্ষু,
হলুদ গাঁদার প্রায় কপোল,
নাই, আর নাই, পেয়েছে ক্ষয়
কাঁদো, কাঁদো, প্রেমিকনিচয়;
চক্ষু আছিল যেন সবুজ শাপল!
হে ডাকিনী যোগিনী!
এস ডাকে অভাগিনী!
দুগ্ধফেননিভ হস্ত লয়ে;
ডুবাও হস্ত রক্তস্রোতে
প্রিয় মোর নিহত তোমাদেরি হাতে,
কাটিয়াছ জীবন রেশম বৃহৎ কাঁচি লয়ে।
জিহ্বা, কথা কয়ো না আর;
এস বিশ্বস্ত তরবার!
দাও মোর বক্ষযুগল ঘাটায়ে!
[নিজবক্ষে অস্ত্রাঘাত]
চলিলাম বন্ধুগণ!
এবার শমন-ভবন!
ছাড়ি দাও মোরে শেষ বিদায়ে! [মৃত্যু]

থিসিয়াস। বংশে বাতি দিতে রইলো এখন চাঁদ আর সিংহ।

ডিমিট্রিয়াস। আর দেয়াল রইলো।

বটম্। [হঠাৎ উঠিয়া] না, না দেয়াল আর নেই। এদের পরিবারের মাঝখানে যে দেয়াল ছিল সেটা ভেঙে গেছে। এসব পরিশিষ্টটা শুনবেন দয়া করে? নাকি আমাদের দুই নাচিয়ের খ্যামটা দেখবেন?

থিসিয়াস। পরিশিষ্টের দরকার নেই; তোমাদের নাটকের পক্ষে কোনো ওকালতির প্রয়োজন নেই। ওকালতি কক্ষণো করবে না; অভিনেতোরা যখন মরে ভূত; কেউ অবশিষ্ট নেই, তখন পরিশিষ্ট দিয়ে কি হবে? কি জানো, যিনি এ নাটকের রচয়িতা তিনি নিজেই যদি পিরামুস-এর ভূমিকায় নামতেন এবং থিসবি-র মোজা গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়তেন, তবে সত্যি একটা করুণ রসঘন নাটক হোতো। তবু বেশ হয়েছে, অভিনয়টা খুব ভাল হয়েছে। লাগাও, খ্যামটা লাগাও; পরিশিষ্ট শিকেয় তোলা থাক। [নৃত্য]
মধ্যরাত্রির ধাতব কণ্ঠ দেউড়ি থেকে বলছে হেঁকে,
যামিনী গভীর! চলো, শুয়ে পড়ি সবাই।
গভীর নিশীথে পরীদের অধিকার, মন্ত্রমুগ্ধ মুহূর্ত!
রাত্রি যেমন কেটেছে প্রায় আনন্দ-জাগরণে,
তেমনি আবার সমাগত ভোরে নিদ্রায় হবো অচেতন।
উদ্ভট এই নাটক দেখে অজান্তেই কেটেছে কাল,

স্খলিত চরণ এগিয়েছে রাত্রি ক্লান্ত পদক্ষেপে।
চলো যাই শয্যায়। পনেরো দিন চলবে উৎসব,
প্রতিরাত্রি আনন্দমুখর নিশ্চিন্ত কলহাস্যে।
[সকলের প্রস্থান। পাক-এর প্রবেশ]

পাক্। এখন দূরে ক্ষুধার্ত সিংহের গর্জন,
চাঁদের পানে নেকড়ে-বাঘের বিলাপ;
ক্লান্ত কৃষকের নাসিকার তর্জন,
সাঙ্গ দিনের শ্রান্ত কার্যকলাপ।
শীতের আগুন নিভু নিভু রক্তিম আভায়
নিঃসঙ্গ প্যাঁচা ডাকে তীক্ষ্ণ চীৎকারে,
শোকাচ্ছন্ন যে জন কাতর নিদ্রাহীন শয্যায়
মরণভয়ে কেঁপে উঠে ইষ্টনাম করে।
এই সেই মুহূর্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,
প্রান্তরের কবরগুলো হাঁ করে মুখ আক্রোশে
বেরিয়ে আসে প্রেতাত্মারা দিনে যারা প্রচ্ছন্ন,
ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ের পথে ভৌতিক অট্টহাসে।
আমরা যক্ষ, আমরা পরী, ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে
তিন ডাকিনীর শাপের ভয়ে শুধুই চলার তাড়া;
সূর্যের রোষের দৃষ্টি কাঁপায় মোদের ত্রাসে,
অন্ধকারের পশ্চাতে স্বপ্ন-সম ঘোরা।
রাত্রি মোদের খেলার সময় উন্মাদনার খেলা;
এই শূন্য দেউল থাকবে শুধু শান্তিসুখের মেলা।
ঝাঁটা হাতে ভূতা আমি যক্ষরাজের আদেশে,
ধুলো ঝাড়বো আনাচেকানাচে দরজা-কপাট পাশে।
[ওবেন, টিটানিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ]

ওবেরণ। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দাও আলোকমালার রাশি;
উৎসবদীপ মৃতপ্রায় ঢুলছে জ্বরের ঘোরে;
যক্ষ, পরী, নৃত্যছন্দে ঘোরো আঁধার নাশি,
মালতীলতায় মুক্ত পাখী যেমন ছন্দে ওড়ে।
কণ্ঠে তোলো গুণ গুণ গান,
নৃত্য করো মুক্ত প্রাণ।

টিটানিয়া। দেখিস যেন ভুল না হয় গানের একটি স্বরে,
প্রতি তানকে স্পন্দিত কর মীড় গমক সুরে;
নৃত্যে তোদের প্রাণ ঢেলে দে হাতে হাত ধরে,
নূপুর থেকে আশীর্বাদ পড়ুক গৃহে ঝরে।
[নৃত্য ও গীত]

ওবেরণ। এখন থেকে উষার আলো যতক্ষণ না ঝরে,
যারে পরী ছুটে যা এ গৃহের ঘরে ঘরে;

প্রত্যেকের ফুলশয্যা করবো মোরা মন্ত্রঃপূত,
অনাগত শিশু হবে কল্যাণময় শুভ-সূত;
তেমনি থাকরে পিতামাতা পরস্পরের অনুগত,
সুস্থ সবল নিটোল হবে শিশু ওদের অনাগত
মাঠের তৃণের শিস থেকে চুঁইয়ে আনা এই শিশির
ছিটিয়ে দেবে ঘরে ঘরে নিদ্রামগ্ন শয্যা নিশির;
এতেই আছে শান্তিমন্ত্র অশেষসুখ ভবিষ্যতে
এতেই আছে শান্তিমন্ত্র অশেষসুখ ভবিষ্যতে
যা রে ছুটে, করিস দেখা প্রভাতলোক-সমাগত।

[ওবেরন, টিটানিয়া ও অনুচরবর্গের প্রস্থান।

পাক্। ছায়াজগতবাসী মোরা, দিয়েকি কি কষ্ট খুব?
মনে ভাবুন এইটুকু তবেই আবার হৃষ্ট রূপ:
ভাবুন না কেন চোখে হঠাৎ লেগেছিল তন্দ্রাঘোর,
যা দেখেছেন সবই খেয়াল, সবই স্বপ্ন, মায়ার ঘোর?
অক্ষম এই নাটকখানা, ঠাকুরমার এই রূপকথা,
খেয়ালখুশীর বিদ্রোহ এ, চৈত্ররাতের স্বপ্নগাথা।
দয়া করুন, বকবেন না, আমরা খুব অভাজন;
ভবিষ্যতে সত্যি গল্প করবো মোরা উথাপন!
তবু সব মিথ্যাই কি মিথ্যা নাকি? সব সত্যি কি সত্যি?
মনের ভেতর ছায়ার জগৎ নেই কি একরত্তি?
সর্পাঘাতে না যদি মরি, কিম্বা জলে ডুবে,
খুব শিগ্‌গির পুনরায় দেখা হবেই হবে;
নইলে আমি মিথ্যাবাদী! নমস্কার! নমস্কার!
রবিন আমি বলছি দেখা হবে পুনর্বার! [প্রস্থান]

অনুবাদ : **উৎপল দত্ত**

॥ সমাপ্ত ॥

যে যেমন সে তেমন

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ আর বরুণ এক মায়ের দুটি স্তনের মত এক ভাব-রসে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল ষোল বছর বয়েস পর্যন্ত। কে বলবে দুজন বন্ধু, যেন দুটি যমজ ভাই। নাম দুটি এক ধরনের, কিন্তু পদবীতে তফাত ছিল। অরুণ চাটুজ্যে আর বরুণ সরকার। চেহারাতেও খুঁটিয়ে দেখলে কিছু অমিল ছিল। অরুণের নাকটি চাপা মুখখানি গোল, বরুণের মুখখানা একটু লম্বা ধাঁচের, নাক চোখা।

তবু অরুণ আর বরুণ অন্তরে এক। ম্যাট্রিক পাশ করল দুজনেই, তখন ওদের বয়েস ষোল। এ পর্যন্ত ওরা সর্বদা সবজায়গায় একসঙ্গে থাকত। অরুণ সিনেমা গেলে চোখ বুজে বলা যেত বরুণও সিনেমা গেছে। বরুণ সার্কাসে গেলে অরুণ খেলার মাঠে যেতে পারে না, তাকে সার্কাসে যেতে হবে।

ম্যাট্রিক পাশ করবার পর দুজন দু কলেজে ভর্তি হোল। তখন থেকেই একটু জোড় ভাঙল। অরুণ চাটুজ্যে আর্টস্ নিয়ে পড়ল বি.এ. পর্যন্ত আর বরুণ আই.এস-সি. পাশ করে কারিগরী বিদ্যালয়ে গেল বাড়ির নির্দেশে। এ সময় থেকে সর্বদা তাদের একসঙ্গে দেখা যেত না সত্যি, কিন্তু ভাবে আর ভাষায়, চিন্তায় আর কল্পনায় দুজনের মিল ছিল অদ্ভুত। অরুণ যদি বলত, সিনেমা আমাদের দেশের বড় ক্ষতি করছে, বরুণ তাতে অবধারিত নিয়মে সায় দিত, পরে একটু ভেবে যদি ধীরে ধীরে শোনাত যে ক্ষতি করছে বটে, তবে তেমন শিল্পী মানুষের হাতে পড়লে এ-ও একটা শিল্প হয়ে উঠতে পারে। বরুণ সায় না দিতে পারত না।

সব মন ঢেলে সায় দেয়া আর মন রাখবার জন্যে সায় দেয়া, দুটো এক কথা নয়। ওরা বোধহয় সেই সময় থেকেই একটু একটু বুঝতে পারছিলো যে কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো ভাবনায় মন রাখবার জন্যে সায় দিতে হয়। নিজের একান্ত আপন চিন্তা বোধ করি পুরোপুরি মাথায় আসে না। এ ওর চিন্তাকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে, ও এর ভাবনাকে স্পষ্ট হতে দেয় না। তার একটা মস্ত কারণ, দুজনের ওপর দুজনের মমতা।

এ ভালবাসা যেন নিজেদের ব্যক্তিত্বকেও অস্বীকার করে চলেছে দিনের পর দিন।

ঠিক এই সময় থেকেই ওরা বুঝতে পারছিল, মনের কোন একটা জায়গায় ওরা ভিন্ন, এক নয়। দুটো পুরোপুরি মানুষ দুটোই, একটা নয়।

যুদ্ধ শুরু হোল এই সময়টায়। বিগত ভয়াবহ যুদ্ধ। ভয়াবহতা যুদ্ধে নয়, মানসিকতায়। প্রাণের দাম, মনের দাম, মানুষের দাম দাঁড়াল একটামাত্র বুলেট। মানুষ তৈরির দাম নেই, মানুষ মারার কারিগর যে সবচেয়ে পোক্ত, তার দাম সবচেয়ে বেশী।

বরুণ সরকার মস্ত চাকরি নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল। বারণ করেছিল অরুণ, কি দরকার মরতে যাবার নয়তো বা মারতে যাবার। তার চেয়ে কলকাতায় কোথায় কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়ে থাকলেই হোত।

বরুণ স্পষ্টভাবেই একমত হতে পারল না। শেষটায় অরুণের মন রাখবার জন্যেই বাড়ির দোহাই দিতে হোল। অনেক টাকা মাইনে, দাদাও বলছে।

অরুণ বুঝল আপত্তি জানিয়ে লাভ হবে না। মত না দিলে তাদের ভেতর আজই এই মুহূর্তে থেকে দু'রকম মতের সূত্রপাত হবে। তাই এবারে শেষবারের মত মন রাখবার জন্যে সায় দিতে হোল।

এই শেষবার। এরপর আর কোনদিন তারা একমত হয় নি, হতে পারে নি।

যুদ্ধ থামল। দাঙ্গা থামল। বরুণ ফিরে এলো। অরুণ তখন একটি কলেজের অধ্যাপক। কয়েক বছরের ভেতর অরুণের কি যে হোল ও নিজেই ধারণা করতে পারল না। চোখের সামনে দেখলো, মানুষ কত রকমে কতভাবে নিজেদের অপমান করছে। নিশ্চিহ্ন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। যে মতবাদ মানুষ তৈরী করেছিলো, সেই মতবাদের কুয়োর বিষাক্ত জলে নিজেরা ডুবে মরছে। অরুণ অস্থির হয়ে উঠলো। এ অস্থিরতা এমন একটা অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছোল যে ওকে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে হোল তক্ষুণি। ধরতে গিয়ে কোথায় যে কি ছিঁড়ে গেল, সেদিকে নজর দেবার মত অবসর ওর ছিল না। অস্থির মনে স্থির ভাবনা আসে না। তবু ও যেন বাঁচতে চাইল কোনমতে। পাশে বরুণ যদি থাকত, তবে এতটা অসহায় মনে হোত না নিজেকে, মা থাকলেও এতটা হোত না। বছরখানেক আগে মা মারা গেছেন। অরুণের সংসারের শেষ বন্ধন। অরুণ একা থাকত দোতলায়। একতলাটা ভাড়া দিয়েছিলো। একা একা এমন একটা নিরুপায় নিঃসহায় মনে হোল নিজেকে যে এই দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে অনেকগুলো ক্ষেত্রে ও নির্মম হয়ে উঠল। কঠোর সংযমের ধৃত সে আঁকড়ে ধরে মনে একটা উত্তেজনার সান্ত্বনা পেলো।

মা মারা যাবার পরে রেবা মাঝে মাঝে আসত ওর কাছে। মাসতুতো বোঁদির বোন রেবা। বি, এ, পাশ করে বিয়ে হচ্ছে না। অনেক পাত্রপক্ষের অপছন্দের পাত্রী রেবা নিজের ভাগ্যকে উপহাস করবার জন্যে বোধ হয় বাড়িতে বলেছে, বিয়ে আর সে করবে না। চাকরির চেষ্টা করবে। দু-একটা মাস্টারীর খোঁজ বা মেয়ে পড়ানর কাজ যদি পাওয়া যায় তাই অরুণের কাছে আসা।

অরুণ যখন জানল রেবার বিয়ে না হবার অপরাধ ওর মস্ত মাংসল দেহখানা, ময়লা রঙ, আর ওদের পরিবারের অর্থাভাব, তখন থেকেই অরুণের মনটা মমতায় ভরে উঠল ওর জন্যে। সে মমতা যে কোন সময়ে আকাঙ্ক্ষার রূপ নিয়েছিলো সে খবর অরুণ জানত না। দিন, ক্ষণ, তারিখ মনে নেই। শুধু মনে আছে, যেদিন রেবাকে জড়িয়ে ও চুমু খেয়েছিলো, সেদিন প্রথম মনে হোল রেবার দেহের মাংস শুধু মাংস নয়, তাতে উত্তাপ আছে। আর সে তাপ অনেক ব্যথা সারিয়ে তোলে। আরাম দেয়।

রেবাও জানল, এমনি করে তার দেহের তাপে অরুণকে তাতিয়ে তাতিয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলে যদি তার বিয়ের প্রদীপ জ্বালান যায়, তবে মন্দ কি? ভাগ্যকে উপহাস করতে গিয়ে দেখল ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে উপহাসে, তোষামোদে নয়। ভাগ্যকে তোষামোদ করতে গেলে সে যেন পেয়ে বসে, খুশিমত মানুষকে নাচাতে থাকে। রেবা সুখ পেলো। ও সাধারণ মেয়ে, অরুণকে পেলে ও সুখী হবে। সংসারে যা কিছু সুখ মানুষ চায়, সবই পাবে। আর ভালবাসা? প্রেম? অতশত বোঝে না রেবা। কটা মেয়েই বা বোঝে?

অরুণও ওই ধরনের একটা কিছু হয়তো ভেবে থাকবে; কিন্তু ইদানীং সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কিছুদিন ধরেই রেবা লক্ষ্য করছিল, অরুণ ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে? অরুণ উত্তর দিয়েছিল, ভাল লাগে না। হঠাৎ এত ভাল না লাগবার কি কারণ হোল রেবার মত সাধারণ মেয়ের সাধারণ বুদ্ধিতে তা ধরা পড়ল

না। ও অবাক হোল, আতঙ্কিত হোল। তারপর একদিন নাটকীয় ভঙ্গীতে অরুণ বললে, —তোমার সঙ্গে এতদিন যা করেছি, পাপ করেছি, পাপ আর বাড়াতে চাই নে। তুমি আমাকে রেহাই দাও। আমাকে ক্ষমা করো।

রেবা অবাক হোল। এত বড় অপমানের পরেও একটা কথা বলল না। নীরবে মুখ ম্লান করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই থেকে রেবা আর আসেনি। অরুণ খুশি হয়েছে। এখন মেয়েমানুষ সম্পর্কে অরুণ অত্যন্ত সাবধানে চলে। পারতপক্ষে মেয়েমানুষের দিকে তাকায় না। কথা বলে না। মনকে ও এক চড়া সুরে বেঁধে ফেলেছে। শুধু কি তাই? অতি কঠিন তত্ত্ব আলোচনা নিয়ে দিনরাত মনকে মন্ত্র পড়া সাপের মত ফণা নামিয়ে রাখতে চায়। একটু তামাসা করতে এমন কি প্রাণ খুলে হাসতেও ভয় পায়, পাছে বাঁধনটা হাসির দাপটে পট্ করে ছিঁড়ে যায়। বেঁধে রাখতে হবে। সংস্কৃত স্তোত্র আর মন্ত্রের বাছা বাছা কঠোর দুর্বোধ্য শব্দগুলোর চাপে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখতে হবে, তবেই আরাম। আর রেহাই। আরামটা এই ভেবে যে বায়ুর মত যে ফসকে যায়, এমন মনকেও বেঁধে ফেলেছে, আর রেহাই পাপের ভয় থেকে। না, পাপ আর নেই। ধীরে ধীরে একটা মস্ত কিছু হয়ে উঠতে পারা যাচ্ছে। সংসারে যখন সর্বত্রই পাপ আর দুর্নীতি তখন আমার সঙ্গে তুলনা কার? অনেককেই কৃপা করতে পারা যায়। যেমন বরুণকে। বরুণকে শুধু কৃপা নয়, ঘৃণা করতেও বাধে না অরুণের। ঘৃণা করবে না-ই বা কেন। বরুণ সরকার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে জন্তু হয়ে। ও কি আর মানুষ আছে? মদ খায় না হয় খাক। শাস্ত্রেও এখানে সেখানে খুঁজে পেতে সোমরসের উল্লেখ দেখতে পেয়ে ক্ষমা করা যায়; কিন্তু তাই বলে নারীসঙ্গ? আর যথেচ্ছভাবে যে কোন নারীসঙ্গ! অরুণ স্তম্ভিত হোল দেখেশুনে।

বরুণ ওর বাসায় অরুণকে নেমন্তন্ন করেছিলো যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। একমাত্র বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হবার বাসনায় অরুণ চঞ্চল হোল, পরমুহূর্তেই ভাবল, না, অত চাঞ্চল্য কিসের? স্থিতধী হতে হবে। মনের ওপর কিছু প্রক্রিয়া চললো। তারপর খুব শান্তভাবে গিয়ে হাজির হোল বরুণের বাসায়। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে লক্ষ্য করলো অরুণ, বরুণের চেহারা-কে-চেহারাই পালটে গেছে। পিছনটা মোটা আর হাত-দুখানা মোটা আর ভারী। গালে কিছু মেছেতা দেখা দিয়েছে আর বরুণের অমন সুন্দর চোখদুটো যেন গোলালো আর লাল। এ কি চেহারা হয়েছে বরুণের! অরুণকে দেখে বরুণও অবাক। বিশীর্ণ মুখে ক্লান্তি আর বিষাদ স্পষ্ট। কপালে দু'তিনটে ভাঁজ পড়েছে। কথা বলছে যেন চিঁ-চিঁ করে। —কিরে, টি-বি-তে ভুগছিস নাকি? ব্যাপার কি? বিয়ে করেছিস, বউ বুঝি পাত্তা দিচ্ছে না? প্রেম করতে গিয়ে মেয়েমানুষের মার খেয়েছিস না কি?

আরে রাম! রাম! বরুণের কদর্য কথাগুলো শুনে তখুনী উঠে যেতে ইচ্ছে হোল অরুণের। তবু না, উঠবে না। বরুণ ওর বন্ধু। সে পাঁকে পড়লে তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অরুণ মুখটা খুব মারাত্মক গম্ভীর করে তাকাল। বললে,—ও সব কথা ছাড়ো। তারপর যুদ্ধে গিয়ে মানুষের কিছু উপকার করতে পারলে?

—উপকার! হো হো করে হেসে ওঠে বরুণ, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে। যুদ্ধে আবার উপকার কিসের রে! হোলসেল অপকার। কে কার কত অপকার করতে পারল তার ওপরই তো সব কিছু চলে। যাক গে, কি খাবি বল? পরোটা কাবাব, না ভাত মাংসের ঝোল? বলতে বলতে পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ ঘোরাল বরুণ। অরুণও। দেখল, একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। পাতলা শাড়ি ভেদ করে যৌবনের সব চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মাংসল হাতদুখানা আঁটসাঁট চামড়ায় মোড়া। তাতে আরও স্পষ্ট চোখে পড়ে তার অটুট যৌবন। ডাঁসা পেয়ারার মত শক্ত অথচ শাঁসালো মেয়ে বাঙালীর ঘরে বড় একটা চোখেই পড়ে না। রঙ একটু ময়লা কিন্তু খয়েরী চোখের তারা যেন ময়লা রঙকে উগ্র করে তুলেছে। তাকালো অরুণ। চোখ নামাতে পারলো না। না, চোখ আটকে গেছে মেয়েটির শরীরের বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গে। অরুণের বিশীর্ণ মুখ মুহূর্তের জন্যে রক্তাভ হয়ে উঠলো। শরীরটা যেন ঝাঁকানী দিলো কয়েকবার। কাণ দুটো গরম হয়ে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মনটা হায় হায় করে উঠলো। ছি, ছি, এমনভাবে মেয়েমানুষের দিকে সে কি করে তাকাতে পারলো! নারী তার ভোগ্য নয়। আর কোনদিনই ভোগ্য হতে পারে না। এই মুহূর্তের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? কেন তার এমন আকস্মিক স্খলন হোল?

—আরে এই যে রাণী! এসো। আমার বন্ধু অরুণ। বরুণ তাকালো অরুণের দিকে। অরুণ আর কোনমতেই মুখ তুলতে পারছে না। মুখ তুলতে হবে ভাবতেই ভয়ে ঘেমে উঠেছে অরুণ।

—তা হলে কি রান্না হবে? মেয়েটির জিজ্ঞাসা শুনল অরুণ। বরুণের উত্তরও শুনল।

—ভাত আর মাংস করো, কি বলিস অরুণ?

অরুণ একটা কথাও বলতে পারছে না। মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। একটু পরে পায়ের শব্দে বুঝল মেয়েটি চলে গেছে।

বরুণ বললে, কি-রে, তুই একেবারে হেডমাস্টারের সামনে ছাত্তর মত গোঁজ হয়ে রইলি কেন? কি হোল তোর? ও ভাবছিস, এমন একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করলুম কি করে? দূর গাধা, বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। ওটাকে জোগাড় করে এনে রেখেছি। চিটাগাংয়ে থাকবার সময় দেখতুম, মেয়েটা ইয়াংকী সৈন্যদের কাছাকাছি ছুকছুক করে ঘুরছে। ও ব্যাটাদের দৃষ্টি পড়বার আগেই সরিয়ে নিয়ে রাখলুম একটা ঘরে। মেয়েটা খুব গরীব আর কি। পরে শুনলুম চিটাগাংয়ের জেলেদের মেয়ে। জেলের মেয়ে না হলে অমন শরীরে বাঁধন হয়। যাই বলিস, মেয়েমানুষের যৌবন যদি বলিস, রাণীর মত অমন যৌবন হাজারে একটা মেলে না। আসবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এলো। যাক। মনটা-আশটা খেয়ে যখন বেসামাল হই, তখন রাণীর মত জাঁদরেল মেয়ে বলেই সামলাতে পারে। আমাদের চাকুরে ঘরের ফিনফিনে মেয়ে হলে ফিটের ব্যামো হয়ে যেতো। বলে জোরে হেসে ওঠে বরুণ।

অরুণ তখন দরদর করে ঘামছে। এক মুহূর্ত বসতে পাচ্ছে না আর। উঠে পড়ল অরুণ। তাকালো বরুণের দিকে। কোনমতে বললে,—শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আজ চলি ভাই। আরেকদিন আসব। আচ্ছা, চললুম। বরুণকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে অরুণ সেদিন চলে এলো। চলে তো এলো। কিন্তু আসবার পর থেকে বরুণের ওপর ঘৃণায় আর রাগে ও যেন জ্বলতে থাকলো দিন রাত। দিনটা তো তবু কাটে, রাত্তিরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরুণের থুম্পো থুম্পো চেহারাটা। আর, আর ওই মেয়েটা। মূর্তিমতী কামের মত মেয়েটার প্রত্যঙ্গগুলো কি জঘন্যভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর কল্পনায়। কামনার কালি আর লালসার লালা দিয়ে যেন তৈরী মেয়েটা। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন সব মেয়ে কেন থাকে। দেশ তো স্বাধীন হোল বলে, এখন এ ধরনের মেয়েগুলোকে জেলে পুরে দেয়া যায় না? নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায় না? ইস্! কি অপবিত্র! কি ঘৃণিত! বরুণকে মনে পড়লেই মেয়েটাকে মনে পড়ে। বরুণ ওই নরম মাংসল দেহটা থেকে কি আনন্দ পায়!

কি জঘন্য আনন্দ! জেলে দেয়া উচিত! চুলোয় যাক। এ সব আর ভাববে না অরুণ। নরকে যাক বরুণ! নরকে যাক মেয়েটা! আর কোন সম্পর্ক রাখবে না অরুণ। ও সব মেয়ের কথা ভাবাও পাপ। আর পাপ করতে সে রাজী নয়। তবু ঘুম হতে চায় না। বরুণের ওপর রাগে, ঘৃণায়।

তৃতীয় রাত বিনিদ্র কাটাবার পর মত বদলায় অরুণ। সে আর একবার বরুণের বাসায় যাবে বলে স্থির করে। এ সঙ্কল্পের পেছনেও একটা ভয় কাজ করেছিল। দুদিন রাত্রে ঘুম না হবার পর ওর ধারণা হয়েছিলো যে ও একটা ব্যাপারে একটু অন্যায় করে ফেলেছে। সেদিন ওভাবে না খেয়ে চলে আসায় বরুণ নিশ্চয়ই আহত হয়েছিলো, তাছাড়া কাজটা ভদ্রতার দিক থেকেও অন্যায়। হয়তো সেই অন্যায় বোধটুকুই ওকে স্থির হতে দিচ্ছে না। একবার দেখা করে এ অন্যায়টুকু সেরে এলেই ঘুমোতে পারবে। এমন একটা অস্বস্তিকর ভাব থাকবে না। হাজার হোক, বরুণকে ও ভালবাসে, এটা অস্বীকার করতে পারে না। সেদিন সন্ধ্যের মুখে গিয়ে পৌঁছোল বরুণের বাসায়।

দোরে শব্দ করতে দরজা খুলে দিল রাণী। বরুণ নয়। কথা বলতে গিয়ে কথা আটকে যায় ওর মুখে। বোবা হয়ে যায় যেন। অরুণের চোখদুটো আপনা-আপনি নীচু হবার কথা, কিন্তু তা না হয়ে চোখদুটো আরও বিস্ফারিত হয়। এ কি বেশ-বাস! রাণীর পরণে শায়ার মত ঘাগরা আর বুকের আঁট জামার তলায় পেটের খানিকটা অংশ নিরাবরণ। একটা পাতলা ওড়না ঢেকে দোরটা খুলে দাঁড়ায় রাণী। টান-টান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অরুণ কথা বলবে কি, ওর বুকের ভেতরে গরম সাঁসে যেন টগবগ করে ফোটে। কি বলতে এসেছিল, কেন এসেছিল, সব যেন ভুল হয়ে যায়। সামনে দাঁড়ান রাণীর টান-টান দেহখানা ওর চোখে আর চোখ থেকে মগজে নেশার মত একটা আতপ্ত আরামের স্রোত বইয়ে দেয়।

রাণী শব্দ করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে টলতে টলতে ভেতরের দিকে চলে যায়। অরুণ একটু একটু এগোতে চেষ্টা করে। রাণীর হাসিটা যেন সশব্দ বিদ্রূপের মত ওর সর্বাঙ্গে এক গামলা গরম জল ঢেলে দেয়। জ্বলতে জ্বলতে এগোয় অরুণ। সেই বারান্দায় বসে রয়েছে বরুণ। রাণী বসেছে পাশের চেয়ারে। মুখ দুহাতে ঢেকে হাসির দমক সামলাচ্ছে, অরুণ কাছে এসে দাঁড়ায়। বরুণের হাতে গেলাস, টিপয়ের ওপর তিনটে বোতল। একটা ডিসে কিছু ভাজা-ভুজি।

বরুণ ওর দিকে তাকায়। আয়, বোস।

বরুণের চোখদুটো টকটকে লাল। কথা স্পষ্ট নয়। জড়িয়ে বলছে। রাণী মুখ তোলে, ওর ওড়না ঘাড়ের ওপর থেকে খসে পড়ে যায়। সামনের টিপয়ে একটা খাটো গেলাসে একটু বোধহয় অবশিষ্ট ছিল। খেয়ে ফেলে রাণী। খেয়েই অরুণের দিকে চোখ পড়ে। খয়েরী চোখের তারা ঝিলিক মারে। হাসতে হাসতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে রাণী। পিনোমত পয়োধরের ওঠানামার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় অরুণ। এ যেন স্বপ্ন রাজ্য। নরকের স্বপ্ন! কি জঘন্য, অথচ মনকে যেন টানে। হ্যাঁ টানে। আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। ধরাশায়ী হতে আর বাকী নেই অরুণের।

অরুণ জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে আসে। দরজা দিয়ে বেরোবার আগের মুহূর্তেও আবার শুনতে পায় সেই হাসি। রাণী হাসছে। নিশ্চয়ই ওকে পালাতে দেখে হাসছে।

মাস ছয়েক কেটে গেছে এর পর। এই ছ মাসে আকাশে অনেক মেঘ উড়েছে, গল্পায়

অনেক জল বয়েছে। আরও কত কাণ্ড হয়ে গেছে কত স্থানে। সব খবর কি আর আমরা রাখি। অরুণ বরুণের খবরও বাইরে থেকে রাখা যেত না। বাইরে থেকে খুব যে কিছু একটা বোঝা যেত তাও নয়। ওদের ভেতরেও নিশ্চয় অনেক রোদ্র অনেক বর্ষা এসেছিল। হয়তো কিছু কিছু ঘটনাও ঘটেছিল, তা নইলে দুজন দুজনকে এমন চিঠি লিখে বসবে কেন? চিঠিদুটো দুজনই দুজনকে লিখেছিলো একই দিনে, কে জানে, হয়তো প্রায় একই সময়ে। আর সেই চিঠিদুটো ওদের জীবনকে কি করে আবার কোন পথে চালাল, সে খবর বলবার সাধ্য আমার নেই। তাই সবচেয়ে নিরাপদ ভেবে ওদের দুজনের চিঠিদুটোর হুবহু নকল তুলে দিচ্ছি। আপনারা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা যা ভাবার ভেবে নিন। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞের মত কোন মন্তব্য করার সাধ্যও আমার নেই, সাধও নেই। গল্প বলা আমার এখানেই শেষ।

ভাই বরুণ,

আজ সারাদিন ধরে ভেবে ভেবে অবশেষে এ চিঠি তোকে না লিখে আর পারলুম না। ক্ষমা চাইবার জন্যে, আনন্দ জানাবার জন্যে, নিজেকে আবিষ্কার করে কি পেয়েছি, তাই বলবার জন্যেই এই চিঠি। ইদানীং তোর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলে শুনেছিলাম, মনও কি ভাল ছিল না? বোধহয় না। দিনকতক আগে হঠাৎ আমার ঘরে এসে তুই বসে রইলি চুপ করে, আমি কথা বলিনি। কারণ কি জানিস, তোকে ঘৃণা করতাম বলে। (অবশ্য আজ মনে হচ্ছে তোকে ঘৃণা কখনো করিনি, আসলে তোকে হিংসে করতাম। যেমন হিংসে করে ভোগী ধনী মানুষদের গরীব উপোসী মানুষরা। মূলে তারাও বলে, তারা ক্যাপিট্যালিস্টদের ঘৃণা করে। সত্যিই কি ওটা ঘৃণা, না ঈর্ষা? আর এই ঘৃণা অথবা ঈর্ষাকে মূলধন করে কেউ কি কিছু মঙ্গল করতে পারবে দেশের দশের? কি কথায় কি কথা এসে পড়ল! পলিটিক্স আমি করি না, ওসব কথা থাক। নিজের কথা যা বলছিলাম, তোকে ঈর্ষা করতুম।)

আমি কথা বলিনি দেখেই হয়তো তুইও কথা বলিসনি, মুখটা তোর সেদিনই বড় বিষণ্ণ মনে হোল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর ওঠবার আগে বললি, কিছুই ভাল লাগছে না। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললি, বুঝলাম মন তোর ভাল নেই। তখন কিন্তু বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে পাপে ডুবে আছে, হয়তো তার ভয়াবহ পরিণাম শুরু হয়েছে। আসলে তুই ইন্দ্রিয়ের যে ভোগগুলো করিস, সেগুলো যে জীবনের অতি জঘন্য কাজ, এইটে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। প্রমাণ করছিলাম—কার কাছে জানিস? নিজের মনের কাছে। কেমন জানিস? একটা বাচ্চা ছেলে একটা রঙীন পতুলের জন্যে বায়না ধরে বসলে যেমন তাকে প্রবোধ দিতে হয়, ও নিতে নেই, ওতে নোংরা মাখা, নিলে পাপ হয়। সেই রকম আর কি? আজ স্পষ্ট করে সব বুঝতে পেরে ভারী হাসি পাচ্ছে। বলি শোন, আমি একটু ব্যতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। সত্যি বলতে কি, নিজের মনকে ভাল করে না জেনে না বুঝে মন বেচারীকে চাবকে-চাবকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিলাম। তার একটা মস্ত কারণ ছিল।

ভয়। ভয় পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে যে নির্ভীক ছিলাম তা নয়। বরাবরই মনটা সূক্ষ্ম তারে বাঁধা। সুন্দরকে ভালবাসতাম। যা কিছু অসুন্দর তাকে সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু তখন তো জানতাম না, যা কিছু অসুন্দর তাকে সহ্য করবার তাকে সহজভাবে গ্রহণ করবার শক্তি অর্জন করতে হয়! তাই ভয় পেলাম। তুই চলে যাবার পর একা-একা থাকার ভয়। মা মরে যাবার পর আরও ভয়। যুদ্ধের খবরগুলো পড়ে শিউরে উঠতাম। জানোয়ারও বোধহয় জানোয়ারকে এমন করে মারে না! ভীষণ ভয় পেলাম! এ ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজতে গিয়ে যা কিছু খারাপ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। যা কিছু অমঙ্গল তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। আর সেইটে অভ্যাস করতে গিয়ে এমন একটা বাড়াবাড়ি করে ফেললাম যে নিজের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোকে অস্বীকার করতে গিয়ে বিকৃত হয়ে উঠলাম।

টাকার লালসা ছিল, জোর করে ভাবতে চাইলাম, টাকা অনর্থের মূল; অতএব চাই না। নারীর যৌবন উপভোগ করবার কামনাকে অস্বীকার করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় ভুল করে বসলাম। একটা ক্ষুধার্ত মনকে খাদ্যের অসারতা সম্বন্ধে লেকচার দিলে কি আর খিদে যায়! জ্বলতে লাগলাম। সে কি জ্বালা! তোর সঙ্গে দেখা হবার পর তোর রাণীকে দেখে প্রায় উন্মত্ত হতে বাকী রইল।

তাই হয় ভাই। পোলাও খাবার লোভ হলে পোলায়ের অপকারিতার কথা যতই ভাবো

না কেন, একটু খেয়ে না দেখলে সে লোভ যায় না। ভোগ না করে ত্যাগ করবার চেষ্টার মত মূর্খামী আর নেই। আর এ মূর্খামী যে কত গেরস্থাপরা মানুষ, করে চলেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ আমার মনে হয়, ছোটবেলা থেকে আমাদের সব এক-একটা সন্ন্যাসী স্বামীজী অথবা ত্যাগী মহাপুরুষ তৈরী করবার যে চেষ্টা করা হয়, তার চেয়ে বড় ভুল আর নেই। স্বামীজী ডজনে ডজনে ম্যানুফ্যাকচার করা যায় না। আর তার প্রয়োজনই বা কি? স্ব-ভাবই ধর্ম। প্রতিটি মানুষই যদি তার নিজস্ব ভাব নিয়ে চলে তাতে সে তার স্বভাবে পুরোপুরি বিকশিত হতে পারে। তা না করে যদি অন্য কোন মডেলের ছাঁচে নিজেকে তৈরী করতে চায়, তবে সে নিশ্চয়ই তার স্ব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়।

এ কথা কি তখন ভাবতে পেরেছিলাম! তাই তো আর একটা ভুল করে প্রায় পাগল হতে বসেছিলাম। কোনমতেই যখন তোর রাণীর যৌবনের প্রচণ্ড আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারছিলাম না, তখন রাত প্রায় নটা নাগাদ একদিন বাসায় হাজির হলাম। কি জন্যে গিয়েছি, কেন গিয়েছি, তখন স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলাম না। ঠিক একটি উন্মাদের মত গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। দোর খুলল রাণী। সেদিন রাণীর গায়ে ওড়নাও ছিল না। মুখখানা ওর জ্বল-জ্বল করছে। আর দেহ? রাণীর দেহের অটুট যৌবন যে কোন বাঙালী মেয়ের ঈর্ষার বস্তু—তোর এ কথা আজ মেনে নিচ্ছি। রাণী আমাকে দেখেই হাসতে লাগল। ভেতরে ঢুকলাম। রাণী দোর বন্ধ করে হাসতে হাসতে পিছোতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য দড়ি দিয়ে বেঁধে যেন আমাকে টানতে লাগল। তোর কথা জিজ্ঞেস করে জানলাম, তুই বাড়ি নেই। শুনলাম, তুই কোথায় গেছিস ও জানে না। তুই নাকি সকালে বেরিয়ে গেছিস আর ফিরিস নি। ও কি তবে একাই মদ খেয়েছিল? প্রতিদিন সন্ধ্যায় কি মদ খায়? জানিনে তবে সেদিন যে মদ খেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

আমি যত এগোচ্ছিলাম, ও হাসতে হাসতে তত পিছোচ্ছিল। হঠাৎ মেজের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বেদম হাসতে লাগল। হাসির বেগে পা দুটো নাড়তে নাড়তে ওর শায়া অথবা ঘাগরাটা প্রায় হাঁটুর ওপরে উঠে এলো। মোটা মাংসল দুটো পায়ের গোছ। যৌবনের রসে সুস্পষ্ট। মনে হোল, পৃথিবীর সব সৌন্দর্য কাদা করে কোন কুমোর ওই পা দুখানা তৈরী করেছে। হাসিস না। আমার ঠিক যা মনে হয়েছিল তাই বলছি, সব সত্যি কথা বলব, একটুও লুকোব না। ও উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাসতে হাসতে যেন অস্থির হয়ে উঠল। তারপর অকস্মাৎ কি একটা যন্ত্রণায় বুক কঠিন মেজের ওপর ঘসতে ঘসতে এপাশ ওপাশ করতে লাগল। স্পষ্ট মনে হল ভীষণ জ্বালায় ও ছটফট করছে। সমস্ত শরীরে আমার আগুন ধরে গেল। নীচু হয়ে বসে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, হাসছ কেন? বলো কেন এত হাসছ?

ও এক ঝটকায় চিত হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বুকের চাপে ওর জামার বোতাম কয়েকটা ছিঁড়ে গেছে। আমার তখন কি অবস্থা আমি তোকে লিখে জানাতে পারবো না। ঠিক এমনি সময় ও হঠাৎ আমাকে দুহাতে ধরে টানল। সমস্ত দেহটা ওর আগুনের মত গরম। কি অসহ্য গরম। আবার তেমনি হঠাৎ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে বসল। আমি পড়ে গেলাম ঠিকই, কিন্তু চোখে তখন বাঘের মতো হিংস্র ভাব। নিশ্চয় আমার চেহারাটা তখন জানোয়ারের মত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। ও বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছিল আর হাসছিলো। আমি তখন ওর চেয়েও ভীষণ। আকাশ বাতাস দেয়াল কাঠের যদি চোখ থাকত, তবে তারা দেখতে পেত দুটো জন্তু কি ভয়ানক হয়ে উঠেছে!

একটা কথাও আর বলিনি। নীরবে চোরের মত তোর বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাড়িতে এসে পর পর তিনবার স্নান করেছিলাম। রাত বারোটা থেকে শুরু হোল পাপ-বোধের যন্ত্রণা। সমস্ত রাত ঘরে পায়চারী করেছিলাম। শান্তি নেই। মনে হোল আজকের পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যদি না মরি তবে আমাকে বন্ধ পাগল হয়ে গারদে পেতে হবে। কি যন্ত্রণা আর সংশয়ের বেদনা!

রাত সাড়ে তিনটের সময় নিজে মরব বলে যখন প্রায় স্থির করে ঈশ্বরকে স্মরণ করছি, সেই সময়ই এক অলৌকিক শক্তিতে যেন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ঈশ্বরকে ডাকবার একটা অভ্যাস মাত্র এতকাল করেছিলাম, আজ কেন জানি না, প্রাণ ভরে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। মৃত্যুর আগে শেষবারের মত মনে-প্রাণে ডাকতে লাগলাম। ভগবান এ পাপের কি ক্ষমা নেই? আমাকে কি মরতেই হবে? দু চোখ ভরে জল এলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এই প্রথম নিজের মনই যেন বলে উঠল, না, পাপ আমি করি নি। আমার অবচেতন

স্বভাব আমাকে যা করিয়েছে, তা পাপ নয়। সামাজিক বোধে তা অন্যায় হতে পারে কিন্তু আত্মিক বোধে তা ন্যায়-অন্যায় কিছুই নয়।

ধর্ম মনের স্বভাবকে চেপে পঙ্গু করতে বলে না, বিকাশিত করে পূর্ণ হতে বলে। সেই মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। জানিস বরুণ, আমি আবার বেঁচে উঠেছি, আর তোর জন্যেই বোধহয় বেঁচে উঠেছি। বিশ্বাস কর বরুণ, আর আমি তোকে ঘৃণা করি না। তোকে আমি ভালবাসি। আগের মতই ভালবাসি। আবার তোকে আমি আগের মত ভালবাসতে পারছি।

রেবা বলে একটি মেয়েকে ভালবাসতাম, তাকেও আবার ভালবাসতে পারছি। আজ সকালে তাকে বাসায় ডেকে নিয়ে এসেছি। তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি তাকে আমার প্রয়োজন। তুই রাণীকে নিয়ে আগামীকাল বিকেলে চলে আয়। রেবাও থাকবে।

আসিস কিন্তু। অরুণ।

প্রিয় অরুণ,

তোর জন্যে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি, তাই এ চিঠি লেখা। নিজের জন্যে এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; তবু নিজের কথাও কিছু তোকে বলব, শুনে নিশ্চয়ই তুই খুশি হয়ে উঠবি। প্রথমে তোর জন্যে চিন্তার কারণটা বলি।

প্রথম যেদিন তোকে দেখলাম ফিরে আসবার পর, খুব অবাক হয়েছিলাম। অস্বীকার করব না একটু ভয়ও হয়েছিলো। তোর চোখে-মুখে-কথায় হাবে-ভাবে জীবনের প্রতি কোন মমতা, কোন আনন্দ-বোধ খুঁজে পাইনি। আনন্দ বাদ দিয়ে জীবন কি করে চলতে পারে আমার জানা ছিল না, তাই তোকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, নিশ্চয় কোন প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে ঘা খেয়েছিস, পরে ভেবে দেখলাম সেটাও ঠিক নয়। তা যদি হোত, তবে তোর ভেতর একটা গভীর বেদনার ভাব লক্ষ্য করতাম—আর সে বেদনার ভেতরেও একটা আনন্দ থাকত। তা ছিল না। তোর চোখে-মুখে বেদনা-ভাবনা এ সব বিশেষ কিছুই ছিল না; বরং কিছুটা নিষ্ঠুর নীরস ভাব ছিল। আর ছিল মাঝে মাঝে আতঙ্কের চমক। এইটেই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক। তারপর তোর গোটাকতক কথায় আর ব্যবহারে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তুই যে তোর জীবনের চারদিকে এমন একটা পাথরের দেয়াল গেঁথে তুলেছিস, এ আমি ধারণাও করতে পারিনি। ছোটবেলা থেকে যতদূর জানি, তোকে দুর্বল শান্ত বলে ভাল লাগত। কখনো কোন নেশা বা অন্যেয় জেদ তোর ভেতরে আমি দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। তবে কেন এমন হোল? আমাকে জানিস, কোনদিনই বন্ধনকে আমি স্বীকার করি নি, তা সে নীতির বন্ধনই হোক, আর ধর্মের বন্ধনই হোক আর তথাকথিত ভদ্রতার বন্ধনই হোক। বন্ধন যা তা বন্ধন। আর একটা কথাও আমার মনে হয় যে বন্ধন যত দৃঢ়ই হোক না, তাতে যদি আনন্দ না পাওয়া যায় তবে সে বাঁধন নিজের মনই ছিঁড়ে একদিন টুকরো টুকরো করে দেয়।

কোনদিন বাঁধন মানতে চাই নি। যুদ্ধে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার পরিপ্রম আর ভয়াবহতা আমার মনকে ক্রমে আনন্দ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। কি করে আনন্দ পাওয়া যায় এ সন্ধান চিরদিনই করেছি। তাই তখন দেখলাম, মদ খাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই। মদ খেলাম। প্রচুর মদ খাই। তখনই আমি জানতুম, মদ খেয়ে আনন্দ পাবো না এমন একটা সময়ও আমার জীবনে আসবে, তখন আর মদ স্পর্শও কোরব না। রাণীকে জোটালাম। জেলের মেয়ে দুর্ধর্ষ যৌবন ওর। ওই যে বললাম, আনন্দ। রাণীর যৌবন দুরন্ত আনন্দ দেয়। জানি এ আনন্দ জীবনের সম্পদে টিঁকে থাকে না। নাইবা থাকল, যখন ভাল লাগবে না, ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

মনের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে চাইনি। তার কারণ, আমি জানতুম সকলের মন একরকম নয়, তাই সবাইতেই যে একই জিনিসে আনন্দ পেতে হবে এমন কোন কথা জোর করে বলা মূর্খামী। তাতে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যেন একটা অতি লোভী মনকে জোর করে জেলখানায় বন্ধ করে ভাল করবার চেষ্টা করা। আসল কথা, ভোগ না হলে ত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভোগ না করে ত্যাগ করবি কি? যার বহু ভোগের বস্তু রয়েছে, সেই ত্যাগ করবার কথা চিন্তা করতে পারে। টাকা থাকলে তবে তো টাকা ত্যাগ করবার প্রশ্ন ওঠে, যে দীনদরিদ্র তার টাকা ত্যাগ করবার কি অর্থ হয় আমি জানি না। তার বরং অর্থবানের ওপর ঈর্ষা ঘৃণা এগুলো জন্মাবেই। সেই পরীক্ষায় পড়ে তুই হেরে গেলি। প্রথম দিনই রাণীর

দিকে তুই যেভাবে তাকালি, তাতে আমি অবাক হলাম। তোর চোখে যা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেটা যাচাই করবার জন্যে রাণীকে সেইদিনই জিজ্ঞেস করেছিলাম,—বন্ধুটিকে তোমার কেমন মনে হোল? ও বেধরক হেসে বললে,—চোখ দিয়ে যেন আমায় গিলছিল।

পুরুষ সম্পর্কে রাণীর মতামত অবার্থ সত্য হয়ে থাকে, এ আমি আরও বহুবার দেখেছি। তাই বলছিলাম, অবাক হলাম, চিন্তিত হলাম। তুই যদি আমায় রাণীর সম্পর্কে তোর মনের ভাব প্রকাশ করতিস, তবে তাতে আমার কোন আপত্তিই থাকত না। রাণী তো বিয়ে করা বউ নয়? আবার জিজ্ঞেস করলাম,—আর কি মনে হয় তোমার? ও একটু ভেবে বলল,—মনে হয়, তোমার বন্ধুটিকে দিয়ে পায়ের ধুলো চাটিয়ে নিতে পারি। কাল ধরিয়ে ওঠ-বোস করাতে পারি। একটু ভেবে বলল,—কিন্তু তোমাকে দিয়ে পারি না। আজও পারলাম না। সে কথা যাক।

তোর কথা ভেবে মনটা বড়ই খারাপ লাগল, সেদিন প্রচুর পান করলাম। তোর জন্যে মনটা যত খারাপ লাগছিল, রাণীর দেহটাকে আমার ততই কদর্য মনে হচ্ছিল। কোন আনন্দ পাচ্ছিলাম না।

তারপর আরও কয়েকদিন তোর অবস্থা দেখে মনে মনে ভারী বেদনা পেলাম। তোকে ভালবাসি, তোর এমন একটা বন্দী অবস্থা আমার অসহ্য লাগছিল। মদ খেতে খেতে বোতলের পর বোতল খালি হয়ে গেল। এ কদিন প্রচুর পান করেছি আর ভেবেছি, এর জন্যে এত তাপ! আহা-রে, অরুণটা উপোস করে করে মরে গেল, আর আমার কিনা অরুচি ধরে গেল?

এই সামান্য সব স্ফূর্তি আনন্দে আমার যখন অরুচি ধরে এলো, তখন তোকে হয়তো গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তাও কি পেরে উঠবি? এ সব বস্তু আর আমাকে আনন্দ দিতে পারছে না। এ খবরটা তোর কাছে সুখবর হবে নিশ্চয়ই। তারপর তোর কথা শোন।

রাণীকে একদিন বললাম, অরুণকে একটু খুশি করো। ওটা ঝিমোতে ঝিমোতে মরে যাবে। রাণী প্রথমে একটু আপত্তি জানালেও রাজী হোল। তারপর সেদিন সন্ধ্যায় আমার অবর্তমানে যা ঘটেছে সবই আমাকে রাণী বলেছে, আর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছে। আমিও হাসলাম, ভাবলাম ভালই হোল। কিন্তু পরমুহূর্তে তোর জন্যে ভয় হোল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি, তুই এ ব্যাপারটা এত সহজভাবে নিতে পারবি না। তোর কাছে নারীসঙ্গ ভয়ানক গুরুতর একটা ব্যাপার। আমাদের দেশের অনেকের কাছেই তাই।

সংস্যারের সবচেয়ে সাধারণ সহজ আর অবশ্য যে ব্যাপারটা তাকে নিয়ে মানুষের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা, নীতিবাগিশী বক্তৃতার অন্ত নেই। আমরা তো ভাবলে হাসি পায়। এমন সঙ্কীর্ণ ছোট মন নিয়ে ধর্ম-কর্ম, ন্যায়-নীতি কিছুই হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, যা কিছু গোপন, তাই পাপ। আর পুরুষ মেয়ের এমন একটা দৈনন্দিন সহজ সম্পর্ককে গোপন করতে করতে মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। আর পাপ-পাপ বলতে বলতে চোয়াল ব্যথা করে ফেলছে। এরা করুণার পাত্র। জানি সমাজে এগুলোর প্রয়োজন কিছু পরিমাণে আছে, কিন্তু আত্মার কাছে নেই। ধর্মের সঙ্গে এসব সামাজিক ব্যাপারগুলোর সম্পর্ক সবচেয়ে কম। যে ভাব যে মানুষকে ধারণ করে আছে, তাই তার ধর্ম। তার বিপরীত সবকিছুই অধর্ম।

ধর্মের কথা বলবার আমার কি অধিকার জানতে চাইবি। এ কথা বলবার অধিকার তো চেয়ে বোধহয় আমার বেশী। আমি আজ স্পষ্ট বলতে পারছি, মদ খেতে আমার ভাল লাগে না। নারীসঙ্গও আমার ভাল লাগছে না। আমি আরও অন্য আনন্দের সন্ধান করবো বলে স্থির করেছি। এ সব ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছি। একা থেকে আনন্দ পাচ্ছি। তোদের ভাষায় একটা বৈরাগ্য এসে উপস্থিত হয়েছে আমার মনে আর তাতে আনন্দ পাচ্ছি। ত্যাগের আনন্দ কি সেটা আমি আজ যতটা বুঝতে পারছি, তুই কি করে তা বুঝবি? তোর ভেতরে যে ভোগের লালসার ঘা দগ্‌দগ্‌ করছে। রাগ করিস নে, যা সত্যি তাই বললাম। আমি আগামীকাল কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি, এখন জানাব না। কেন যাচ্ছি, তার কিছুটা জানালাম। পরে যদি নিজের আনন্দকে আরও পূর্ণ করে তুলতে পারি, সেদিন জানাব।

তোকে অনুরোধ করছি, তুই আর কিছু না পারিস একটা বিয়ে কর। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিসনি, তোর মা থাকলে আমার মতই তোকে বিয়ে করতে বলত। বিশ্বাস কর, তোর ভাল হোক, এ আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে চাইছি। এর ভেতরে একটুও ফাঁক নেই। দাদাদের কাউকে কিছু জানালাম না। তাঁরাও তোর মত জানে আমি একটা পাষণ্ড হয়ে গেছি। তুই যদি পারিস, তাদের আমার কথা বলিস। কিই-বা বলবি। বলবি, বরুণ চলে গেছে। কোথায়

চলে গেছে সে কথা আর বলবি কি করে? সে কথা তো তোকেও এখন বলব না। পরে যদি প্রয়োজন মনে করি জানাব।

শেষ কথা বলি, বেশ কিছুকাল ভাল চাকরি করে খরচ করেও কিছু টাকা রয়ে গেছে। রাণীকে হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে আমার এক সহকর্মী অফিসারের জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। মানুষটি ভাল। রাণীকে ভালবাসবে। আর বাদবাকী প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার টাকা একটা ইনসিওর করা খামে তোকে পাঠাচ্ছি, তোকে নিতে হবে। তোর বিয়েতে আমার উপহার বলেই না হয় গ্রহণ করিস। আবার জানাচ্ছি, আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোর মঙ্গল কামনা করি।

ইতি— বরুণ।

আধুনিক সাহিত্য

ভাবগত অর্থে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা আন্দোলনহীন। কবিরা এখন আর কোন সমবেত চিন্তার মাত্রাবন্ধনে পরস্পর যুক্ত নন, কোন সমবেত ধ্বনির অন্তর্নিহিত নন। সীমাশ্রয়ী ব'লে আন্দোলন কিছু পরিমাণে আত্মক্ষয়ী হ'তে বাধ্য, কিন্তু তার অন্তর্গত উৎসাহ বড় কবির অভাব অনেকাংশে পূরণ করে। যুগসম্ভাবনা শোষণে প্রধান কবিরা অগস্ত্যবংশজাত। অপ্রধান কবিরা তা না হ'লেও আন্দোলনযুক্ত হ'য়ে মিলিত তৃষ্ণায় সমুদ্রশোষণ করতে পারেন। সুতরাং বর্তমানকালে, যখন কোন প্রধান প্রতিভা লক্ষ্যগোচর নয়, তখন ভাবগত আন্দোলন অবশ্যই কাম্য। এ কথা বলাই বাহুল্য যে চিন্তার ভূমিপরিবর্তনের ফলেই প্রকৃত আন্দোলন জেগে ওঠা সম্ভব এবং ভাবগত আন্দোলনই সম্পূর্ণ আন্দোলন।

সাম্প্রতিককালে চিন্তার কোন পীঠস্থান পরিবর্তিত হয়নি। কিছুদিন পূর্বের সাম্যবাদী দর্শনের উপলব্ধি এখন নানাকারণে অপ্রখর এবং অস্বচ্ছ। তখন যে নতুন চিন্তা উদ্ভিন্ন হয়েছিল বাংলা কবিতা এখনো তার কিছু ফলধারণ করছে বটে, কিন্তু তাও প্রায়শঃই অপ্রত্যক্ষভাবে। সেই আন্দোলনের ফলেই একালের কবিতা স্বভাবতঃই মানুষ এবং সমাজের অনেক বেশি নিকটবর্তী, অনেক বেশি জীবনলগ্ন। দৃষ্টিভঙ্গির এই গূঢ় গঠন উত্তরাধিকার-বলে এখনো নিঃশব্দে অবস্থান করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কবিরা নিজস্ব রূপাভিসারের দিকেও অগ্রসর হয়েছেন। সাম্যবাদী আন্দোলনকালীন বহির্মুখিতার দাবী অবসিত হ'লে কবির ব্যক্তিসত্তা আবার কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট, তাঁর নিজস্ব কথা, এমনকি নিছক ব্যক্তিগত কথাও, পূর্বের মত আর অপরিবেশনীয় নয়। প্রায় সব কবিই বর্তমানে তাঁদের নিজস্বতাকে নির্মাণ ক'রে সমবেত ধ্বনি থেকে নিজেদের অসম্পৃক্ত করেছেন। ফলে তাঁদের কবিতার ব্যাখ্যায় কোন একক সূত্র আর অবলম্বনীয় নয়। একমাত্র তাঁদের নিজস্ব সূত্রই সেক্ষেত্রে সম্যক আলোকপাত করতে পারে।

এ ঘটনা পূর্ববর্তী আন্দোলনের ক্ষয় থেকে উৎসারিত, তার প্রতিক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত, যদিও একই সঙ্গে সে আন্দোলনের মনীষা একালের কবিতা এখনো ধারণ করছে।

কবিরা সমবেত থেকে নিজস্ব হয়েছেন। সুতরাং স্পষ্টতঃই কেউ আর আন্দোলনে ইচ্ছুক নন্ বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য আন্দোলনহীন হলেও তরুণতর কবিদের রচনা বিশিষ্ট এবং সমবেত লক্ষণহীন নয়। এই বৈশিষ্ট্য প্রধানত প্রাকরণিক—শব্দ এবং ধ্বনি সম্বন্ধীয়। যেমন ধ্বনি বা বিষয়ের সৌকুমার্য, মসৃণতা, লাবণ্য প্রভৃতির প্রতি অনীহা, শব্দ নির্বাচনে সংস্কারহীনতা, কাব্যের আধার নির্বাচনে মুক্ত মানসিকতা, অত্যধিক 'স্মার্টনেস' ইত্যাদি। এ-সব লক্ষণ তরুণতর কবিদের একটি বৃহৎ অংশের রচনায় অনায়াস-লক্ষ্য এবং সেই সঙ্গে অন্তরালবর্তী প্রচ্ছন্ন জেদও পরিস্ফুট। যেন ইচ্ছে করেই, জেনে-শুনেই, পরিণতিচেতন হয়েই তাঁরা এসব করছেন। জেদ সর্বদা বিশ্বাসসূচক না হলেও এক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্বাস অপরিসীম ব'লেই মনে হয়। জেদের কারণ হয়ত কবিদের অতি-প্রখর আত্মসচেতনতা অথবা পূর্ববর্তী আন্দোলনের ক্ষতোৎসারিত ক্রোধ। কিংবা তাঁরা বাংলা কবিতার সংস্কারাশ্রয়ী বিন্যাসে বীতরাগ। অথবা এই সব কথারই জটিল স্রোতোরেখা

তাঁদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে। কারণ যাই হোক্, তার উপরোক্ত ফল আমাদের হাতে পৌঁচেছে।

এরই পার্শ্ববর্তী ধারা অতিরোমান্টিকতায় (সাধারণ অর্থে), অতিলালিত্যে আচ্ছন্ন। এমন তরুণ কবিও রয়েছেন যাঁদের কবিতায় এই দুই চরিত্রই সন্নিবিষ্ট, যদিও তার সমাহার ঘটেনি। তাছাড়া কিছু কবি কেবলই অতিলালিত্যের অস্থিহীন তারল্যে ভাসমান। যে অর্থে মৃতদেহ বিকৃত এই ধারাশ্রয়ী কবিতাও সেই অর্থে বিকৃত। কেননা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রোথিত উদ্ভিদ নয়। সুতরাং মৃত, প্রতিভাহীন। কবি হিসেবে এঁরা সৎ নন্, কবিতা হিসেবেও এঁদের কবিতা আলোচ্য নয়।

প্রথম ধারার কবিতায় নতুনত্বের প্রয়াস যে সদ্যোজাত তা নয়; পূর্বজ ধ্যান থেকে, রূপ-চিন্তা থেকে, প্রধানত জীবনানন্দ দাশের কাব্যধারা থেকে উৎসারিত যদিও ভঙ্গিটা সদ্যোজাতকের, অনন্যপূর্বের। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া তিরিশের অন্য দু'একজন কবিকেও তাঁরা আশ্রয় করেছেন, যেমন বিষ্ণু দে ও সমর সেন। তফাৎ অবশ্য একটু আছে। তরুণতর কবিদের কাব্যে এসব প্রয়াস অত্যন্ত প্রবল, সম্পূর্ণ সচেতন এবং এসবের মধ্যেই বিপ্লব-সন্ধানী। এই বিশেষ বিভাগের মধ্যে তাঁদের মনোযোগ আমূল বিদ্ধ, অনুশীলন একাগ্র। রহস্যসন্ধানে জীবনানন্দ দাশের গভীর থেকে গভীরতর বিন্দুতে ভ্রাম্যমাণতার ইঙ্গিত তাঁদের কবিতায় নেই, চিন্তার দৃশ্যগত বুননে তাঁর পূর্বইতিহাসহীন অপরিসীম নৈপুণ্য এঁদের কবিতায় অনুপস্থিত—অন্তত তার পরিচয় এখনো আমাদের কাছে লভ্য নয়—কিন্তু ভিন্ন মানসিকতার সংরাগী হয়েও এঁদের অনেকে জীবনানন্দের কথনভঙ্গিকে আশ্রয় করেছেন। তার মধ্যে প্রধানত চমকসন্ধান করেছেন।

পূর্বোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি—

দু-জন ছাত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে তিনজন বিশুষ্ক কেরাণি
ভিন্নরূপে ফিরে পায় কান্তিমান কৈশোর শৈশব,
উত্তেজক স্মৃতিপুঞ্জে আগুনের আরকের মতো,
নিঃশব্দে পোড়ালো তারা মৃত্যুহীন সময়ের শব।
সস্নেহে পকেটে পুরে পঁচিখানা অচল দুয়ানি
প্রাণ ভ'রে হেসে নিলো বাতাসের সঙ্গে অবিরত।
(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

নিজস্ব বুকের শব্দে জলপ্রপাতের শব্দ অনুভব ক'রে
পার্শ্ববর্তী কক্ষ থেকে রমণীরা চ'লে যায় দূরের শহরে।
(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

ভালোবেসে সুখ ছিলো, ভালোবেসে দুঃখ কি ছিলো না?
মহিলা বাসিবে ভালো, আমিও তো বাসিব তাহারে
ভালোমন্দ কিছু এক?
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

কমলালেবুর প্রতি যাওয়া ভালো। বহুদূর হতে

উহাদের ব্যবসায় শুরু হয়, ক্রমশঃ মেধায়
রক্তের চাপের ফলে তালকানা-হওয়া থেকে ওই
কমলাফলের হেতু ভেসে উঠি, জ্বরোভাব কাটে।
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

ভালোবাসিলেই দুঃখ। ভালোবাসে জনসাধারণ
কেননা, ওদের আছে ভুলিবার অসীম ক্ষমতা।
(পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

রোঁয়া ওঠা কুকুরের সাহচর্যে গ্রীষ্মের গোধূলি
হয়ত লাগবে ভালো।
(শামসুর রাহ্‌মান)

শবাধারে নষ্ট ফুল, জরায়ু গভীর থেকে ডিম্বের পুতুল
ক্ষোভে আর্তনাদে ভাঙে, রক্তের চীৎকারে কেঁদে ওঠে।
(দিবেন্দু পালিত)

এই ধারার কবিদের কাব্যে সাধারণত জীবন সম্বন্ধে তীব্র তিক্ততা প্রকাশিত। তার নেতি-বিন্দু অবশ্য কোন অস্তিবাচক সিদ্ধান্তের অভিসারী নয়। শুধু বঞ্চিতের, দারুণ ক্ষোভের, ক্ষয়ের আর্তস্বর। সৌন্দর্যের দিকে, সুষম রম্যতার দিকে যে তাঁরা একেবারেই দৃষ্টিপাত করেন নি তা নয়, কিন্তু সাধারণ অর্থে অসৌন্দর্যের দিকে, বিকলাঙ্গ কুশ্রীতার দিকে, জঞ্জালের দিকেই তাঁরা প্রবলভাবে আকর্ষিত। জীবনবিন্যাসের গূঢ় অর্থ হয়ত তাঁরা তার মধ্যেই খুঁজছেন এবং কোন কোন কবি তার নিম্নস্তরবাহী পঙ্কিল স্রোত কবিতার শিরায় রক্তে চালনা করছেন। এর ফলে সৎ কবিতা সৃষ্টি হতে পারে না এ সিদ্ধান্ত তর্কাধীন, কিন্তু বাংলা কবিতা এই পরীক্ষার ফলে কিছু লাভবান হয়েছে ব'লে মনে করার কারণও এখন পর্যন্ত ঘটেনি। এবং যতদিন না ঘটছে ততদিন এই পরীক্ষায় সৎ কবিতা সৃষ্টি হতে পারে এ সিদ্ধান্তও তর্কাধীন থাকবে। সৃষ্টি করেই প্রমাণ করতে হবে, প্রমাণ করার তাছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

এ প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত হ'তে একবার জনৈক অগ্রজ কবি তরুণতর কবিদের প্রচণ্ড সাহসের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নিবেদন করেছিলেন। সাহস জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কবিতার ক্ষেত্রে কোন কবি সাহসের পরিচয় দিলে তাকে অভিনন্দন জানান অন্যান্য কবি এবং পাঠকমাত্রেরই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। কিন্তু সাধারণ সাহস এবং কবিতার সাহসের মধ্যে চরিত্রগত তফাতের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। যে কোন ধরনের সাহসই কবিতার কাজে লাগে না। কোন কবি রাবণের মত রণভূমিতে অবতীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু দেখতে হবে তাঁর সাহসিকতায় কবিতা লাভবান হচ্ছে কিনা। কবিতার সাহসের নিদর্শন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ। কবিতার সাহস মানে অবশ্যই যদৃচ্ছ আচরণ নয়, তার সঙ্গে সার্থক সৃষ্টির প্রশ্নও জড়িত।

মৃগাঙ্ক রায়

এক তরুণ কবির বইয়ের ভূমিকায় একটি খেদোক্তিতে এসে চোখ থামলো : 'বাংলাদেশের কবিদের দল ভাঙাগড়ার ফল আমাকে পেতে হল;' কারণ তাঁর অনেক কবিবন্ধু অধুনালুপ্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু কবিতা সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ-পর্যন্ত নাকি কথা রাখেন নি। উক্ত কবিও আমার ধারণা, নিশ্চয়ই কোন না কোন দলভুক্ত। কারণ শুনতে পাই বাংলাদেশে শিক্ষিতদের দুই তৃতীয়াংশ কবি, এক-তৃতীয়াংশ কোন না কোন সময় কবিতা লিখতেন এবং নিয়মিত কবিদের প্রত্যেকেই নাকি এক একটি দল। জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে হয়ত তাঁর মত পরিবর্তন করে লিখতেন : 'সকলেই কবি, কেউ কেউ কবি নয়।'

'কবি নয়'-এর মধ্যে যাঁরা পড়েন তাঁরা ভাগ্যবান। একজন তথাকথিত প্রতিষ্ঠাবান (কোন কোন সমালোচকের ভাষায় 'প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন') তরুণ কবির খেদোক্তিতে এ কথা এখন আরও বেশি মনে হচ্ছে। তবে অসংখ্য দল হলেও কবিতা লেখার ব্যাপারে কবিরা কিন্তু প্রত্যেকেই পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কবিতার কায়াগঠনে বিষয়বস্তুতে কথনে উচ্চারণে স্বরূপ যমজ সম্পর্কে অন্বিত। প্রায়শই কোন কবিতা কার রচিত নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

অথচ তরুণ বা তরুণতর কবিদের মধ্যে ক্ষমতার অভাব আছে বা তাঁদের রচনার মধ্যে দু চারটি পংক্তি স্মরণীয়ভাবে দ্যুতিত হয়ে ওঠে না এমন নয়। চিত্ররচনায় বা উপমাবয়নে তাঁদের কৃতিত্ব দুর্লক্ষ্য নয়, বক্তব্যের পরিবেশনেও তাঁদের মুন্সিয়ানা পরিদৃষ্ট হয়। ইতস্ততঃভাবে বর্তমান বইগুলি* থেকেই কয়েকটি পংক্তি বা কবিতাংশ তোলা যাক—

রাস্তায় আমার যেতে মনে হয় দুধারের বাড়ি
মস্ত উঁচু ডাঙা, আমি ছোঁড়া ফুল ভাসি জনস্রোতে
(অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, পৃ. ৬০)

ভয়ের এ মুখে সাহসে সহাস মুখোসে করেছি বন্ধ
(ঐ, পৃ. ৩০)

শালশিরীষের ফ্রেমে বাঁধানো এ গ্রাম
নির্জন ঘুমের মতো
(ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল, পৃ. ৪০)

স্নিগ্ধ নিবিড় মুখের মতো সবুজ দ্বীপের মুগ্ধ মায়ায়
(ঐ, পৃ. ২৮)

দু দিকে জানালা, মধ্যে অন্ধগলি
ধোঁয়া পাক খায় সন্ধ্যার নিশ্বাসে
(কয়েকটি কণ্ঠস্বর, পৃ. ১৫)

* ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল—সুনীলকুমার নন্দী। কোয়ার্টেট। কলিকাতা ১৯। ২·৫০
অন্ধকার উদ্যানে যে নদী—তরুণ সান্যাল। কবিপত্র। কলিকাতা ২৬। ২·০০
কয়েকটি কণ্ঠস্বর—মণিভূষণ ভট্টাচার্য। কবিপত্র। কলিকাতা ২৬। ২·৫০

সব স্মৃতি ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
(ঐ, পৃ. ৩০)

এই ধরনের আরও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারত। কিন্তু বর্তমান কবিদের সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, এঁদের বক্তব্য মোটামুটি এক, বক্তব্য পরিবেশনের ভঙ্গীও প্রায় একই রকম; একই ধরনের বক্তব্য একই ধরনের ছন্দে—পয়ারে—পরিবেশন, একই ধরনের চিত্র এমন কি কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দের প্রতি সমান আসক্তি লক্ষিত হয়। সুনীলকুমার নন্দী সম্পর্কে 'কবিপরিচিতি'তে বলা হয়েছে তাঁর কবিতা-গুলিতে 'একটি ব্যথিত অথচ অবিচলিত সুস্থ আধুনিকতার প্রতিলিপি মিলবে।' কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতায় যে-আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা আর যাই হোক সুস্থ নয়। উদাহরণ, 'প্রতিমা' (গ্রন্থের চতুর্থ কবিতা) থেকে জানা যাচ্ছে গাঁয়ের একটি মেয়ের মস্তিষ্ক-বিভ্রম হয়েছিল, সে তার বহু 'পরিশ্রম দিয়ে গড়া সোনার সংসার আর প্রতিমার সমস্ত সম্মান ডুবিয়ে' শেষে 'পড়ত যৌবনে এসে যৌবনের লম্পট তুফানে' নাকি এক অর্বাচীন যুবকের ডাকে ভেসেছিল; অবশ্য কবির মতে সেই যুবক তাকে শেষ পর্যন্ত 'শান্তির পবিত্র তীর্থে' নিয়ে যেতে পারে। 'নীলকণ্ঠী' (ষষ্ঠ কবিতা) কবিতার নায়িকা কয়েকটি যুবককে শিকার করে 'সারা চোখে মুখে' 'কামুক ছোবল চিহ্ন' নিয়ে এঁদো গলি ঘরে' ফিরে যায়। 'লোকটি' (দশম কবিতা) কবিতার লোকটিও 'প্রতিমা'র মতো একদিন 'যৌবনজ্বালা'য় কাতর হয়েছিল। উল্লিখিত পংক্তিগুলিতে আধুনিকতা স্পষ্ট, কারণ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিই কঠোরভাবে সত্য। আজকের সমাজ-সংসার কোন গভীর বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর আর দাঁড়িয়ে নেই, দীর্ঘ-দিন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার পরও স্ত্রী নতুন স্বামীর জন্য ব্যাকুল হয়, জীবনযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য মেয়েদের দেহ বিক্রীও করতে হয়। কিন্তু এইটিই কি একমাত্র সত্য? এই আধুনিকতাই কি 'সুস্থ' আধুনিকতা? অন্তত 'সুস্থতা' সম্পর্কে আমাদের ধারণার মান-দণ্ডে এ আধুনিকতা সুস্থ কিছুতেই নয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মন তখনই কৌতূহলী এবং চিন্তিত হয়, যখন দেখি সুনীলকুমার নন্দীর মতো কিন্তু তাঁর চাইতে বেশি তরুণ সান্যাল এই 'আধুনিকতা'য় একান্তকেন্দ্রিত। প্রমাণ—

প্রসাধন সাঙ্গ করে
একক কঙ্কনে কিংবা হাতঘড়ির দুর্বল ডায়ালে
আমার জীবন যৌন যৌবনের কাল মাপো...
এসো যৌনতায় যৌবনে
(অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, পৃ. ১০)

আমার চোখের সামনে তুমি কী বেহায়া
কী নির্লজ্জ স্বর্ণজানু ভেজা অন্তর্বাসে
ঠেলে উঠছে সাদা
(ঐ, পৃ. ২৮)

আমার কামাতুর কালো রক্তে
(ঐ পৃ. ২৯)

চিনে নিতে চাই বিগত দিনের সুখী
কিশোর পৃথিবী যৌনজড়িত মনে...
শেষ সিগারেটে লাম্পট্যের ঝোঁকে
দীর্ঘ চুমোয় সাজি রতিসজ্জায়
(ঐ, পৃ. ৩৪)

বিলাপের (?) হয়ো না মৌন দেহে নেই সতীত্বের চাবি
(ঐ, পৃ. ৫৪)

রক্তমাংস মুড়ে প্রেমিক প্রেমিকা একজোড়া.
রতিরঙ্গে হামা দেয় আদিম রক্তের তাপে মেতে...
(ঐ, পৃ. ৫৯)

মণিভূষণ ভট্টাচার্যও এ জাতীয় 'আধুনিকতা'য় বিশ্বাসী। তাঁর গ্রন্থের একটি অংশের নাম 'অন্ধকারের গল্প' এবং মোট পঞ্চাশটি কবিতার সংকলনগ্রন্থে 'অন্ধকার' একষট্টিবার ও 'আঁধার' বার তিন ব্যবহৃত হয়েছে; যে কোন কবির পক্ষেই এ ঘটনা দুর্বলতা বলে পরিগণ্য। এই আধুনিক 'অন্ধকার' 'শব' প্রতীক-শব্দের বহুল ব্যবহারেও ব্যঞ্জিত। আর দেহ-আনুষঙ্গিক শব্দপুঞ্জ মণিভূষণ ভট্টাচার্যের রচনাতেও অনুচ্চারিত নয়—

রেডরোডের হাওয়া গাড়ী বহুমূল্য, বুকে পণ্যা নারী
সিনেমা সাহিত্য নারী যৌনতত্ত্ব রাজনীতি গান
শেষ হলে যুবকেরা ডুবে গেলো সূর্যাস্তের রঙে,
সন্ধ্যার দ্রৌপদী দিলো পাঁচ হাতে পাঁচখিলি পান
(কয়েকটি কণ্ঠস্বর, পৃ. ৩৭)

((কৃষ্ণকান্ত বাবু)...
মধ্যরাত্রে ঘরে ফিরে বাড়ান নিরীহ স্ত্রীর শোক,...
আগ্নেয় সুরায়, ঠান্ডা অবসন্ন নারীর শরীরে
নিমগ্ন অস্তিত্বে তাঁর শোনেন নিজেরই কণ্ঠস্বর
(ঐ, পৃ. ৪৪)

তবে তিনি তরুণ সান্যালের মতো ঐকান্তিকভাবে 'শরীরসর্বস্ব শিল্পে' (শব্দবন্ধের কৃতিত্ব সুনীলকুমার নন্দীর) আত্মলীন নন। দেহকে তিনি প্রয়োজনমতো স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর আধুনিকতার 'অন্ধকার' দেহকে অতিক্রম করে আরো বিস্তীর্ণ আরো গভীর হয়েছে। যুগের ক্লান্তি, নৈরাশ্য, বিষণ্নতা, মূল্যবোধের অভাব তাঁর উপলব্ধিকে সজোরে নাড়া দিয়েছে—

গঙ্গাজলে শব দেখি, কী আশ্চর্য, দেখি না স্নাতক
(পৃ. ২১)

জলস্রোত অন্ধকার জলস্রোত অন্ধকারে আমি
সূর্যোদয় দেখি না কখনো। (পৃ. ৪৬)

আমার জীবিত শব ভেসে যাচ্ছে দিকচিহ্নহীন এক সমুদ্রের দিকে
(পৃ. ৪৮)

মাঝে মাঝে পাই নিজের বিবেক বিক্রীর কন্‌ট্রাক্ট
(পৃ. ৬৫)

'যৌবরাজ্যে অসুখী সম্রাট' হলেও জীবনে তাঁর বিশ্বাস বিদ্যমান এবং তা দৃঢ়মূল বলেই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' (পৃ. ২৬-২৭)-এর মতো বলিষ্ঠ কবিতা লিখতে পারেন, যে কবিতায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'আমরা এখনো আছি আলো আর আকাশের দেশে...আমরা মৃত্যুর কথা বলি না কখনো।' এবং 'উদ্ভাসিত জন্ম ও অনিন্দিত মৃত্যু'র মতো আর-একটি উজ্জ্বল কবিতায় জানান, কাচের আধারে ফর্মালিনে দুটি যমজ শিশু দেখে তাঁর মনে হয়েছিল শিশু দুটি 'অকাল সমাধিমগ্ন সম্ভাবিত বুদ্ধ কিংবা যিশু।' আমার মনে হয় মণিভূষণ ভট্টাচার্য দলনিরপেক্ষভাবে স্বীয় প্রত্যয় ও উপলব্ধির পথে রচনার গতি যদি অব্যাহত রেখে যান তাহলে একদিন তিনি আজকের অনেক চীৎকৃত তরুণ কবির খ্যাতি ম্লান করে দিতে পারবেন।

দলের কথা বলতেই মনে হল 'শরীরসর্বস্ব শিল্প' নিয়ে আজকের কোন কোন তরুণ কবির অতিরিক্ত মাতামাতি এবং তৎসংলগ্ন দলীয় চিৎকার। শুনতে পাই, কবিতায় যিনি যত বেশি গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে পারেন তিনি তত বেশি আধুনিক। এই 'আধুনিকতা'র মোহে যদি তরুণ সান্যাল পড়ে থাকেন, তা হলে তাঁর জন্য দুঃখ বোধ করব। কারণ, তাঁর প্রতি কবিতাতেই, বলতে গেলে, দেহজ লোভ উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অথচ তরুণ সান্যাল যখন 'অবসেসড' বা বিষয়বিশেষে আচ্ছন্ন নন তখন তিনি যথার্থ-উত্তীর্ণ কবি। 'পদ্মরাগ' (পৃ. ২১), 'জন্মে জন্মে' (পৃ. ৩১), 'তরঙ্গে তরঙ্গে' (পৃ. ৪৮), 'অন্ধকার উদ্যানে যে নদী' (পৃ. ৫১), 'পুরোনো মাল্লার কথা' (পৃ. ৫৫) বা 'স্মৃতি' (পৃ. ৬২)-র মতো কবিতারচনার জন্য তিনি নিশ্চয়ই পাঠকের ধন্যবাদ পেতে পারেন।

সুনীলকুমার নন্দীও বোধ করি সচেতনভাবে পূর্বোক্ত 'আধুনিকতা'র প্রয়াসী! কারণ তাঁর কবিতাতেও 'রিরংসা', 'লম্পট তুফান', 'ঊরুনাভি-স্তন-স্বর্গ', 'রমণীর আসঙ্গ-আশ্লেষ' ইত্যাদির অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়, তবে তরুণ সান্যালের তুলনায় ঐ সব শব্দ তাঁর কবিতায় কম। কামনাবেগ-নির্ভর, একটু অন্য ভাষায় কখনো বা শরীরী প্রেমকেন্দ্রিক, কবিতা রচনায় তিনি যে দক্ষতা দেখান নি তা নয়, 'প্রতিমা' (পৃ. ১৪) বা 'নীলকণ্ঠী' (পৃ. ১৭) তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে। বিশেষত 'নীলকণ্ঠী' (নামকরণে আমার আপত্তি, কারণ নীল-কণ্ঠের ব্যঞ্জনা নীলকণ্ঠীতে নেই) কবিতায় আজকের নাগরিক জীবনের একটি নিষ্করুণ বিষণ্ন ছবি সার্থকতায় প্রস্ফুট হয়েছে। কিন্তু 'কালের পুতুল' (পৃ. ১২) এবং 'বুদ্ধটি হোক শতায়ু' (পৃ. ২০) নামে যে দুটি কবিতা আমার ভালো লেগেছে, কবি স্বয়ং হয়তো তাদের অনাধুনিক বা অপেক্ষাকৃত অনাধুনিক বলবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার মতো আরো অনেকেই হয়তো ঐ কবিতা দুটি পাঠে তৃপ্ত হবেন।

সবশেষে, কোন কোন জায়গায় ভাষা ব্যবহারে তরুণ কবিদের অসতর্কতার সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ : 'যৌনজড়িত মন', 'কামুক সঙ্গম', ঊরু অর্থে 'জঙ্ঘা', 'প্রেতায়িত শব', 'শান্তবহ নদী'। কোন কোন পংক্তি আমার কাছে অর্থহীন (দুর্বোধ্য ?) মনে হয়েছে—

বালুচর শাড়ি নদী (বেনারসী কাঞ্জিভেরামই বা নয় কেন!)

ক্ষিপ্র আগুনে বাঁধে শরীরের তূণে ('তূণ'=বাণ রাখিবার আধার : চলন্তিকা, পৃ. ২৪০)

জানি যা নীতির অদিতি কোঠায় রমা ('অদিতি' বিষ্ণু, সূর্য প্রমুখের মাতা : পৌরাণিক অভিধান, পৃ. ১৩)

নক্ষত্রের রন্ধ্র ছিঁড়ে আসে ('রন্ধ্র'=ছিদ্র, দোষ : চলন্তিকা, পৃ. ৪৯০)

এই বপ্রক্রীড় (?) স্থূলে প্রসাধনে হৃদয় ভেজে না ('বপ্রক্রীড়া'=দাঁত বা শিং দিয়া মাটি খুঁড়িয়া খেলা হাতি ষাঁড় ইত্যাদির : চলন্তিকা, পৃ. ৩৮০)

নগ্ন সুষুম্নার ডালে তেত্রিশ মৃদঙ্গ (প্রায় 'চর্যাপদে'র দুর্বোধ্যতাস্পর্শী!)

আমাদের দেহ ভেসে যাচ্ছে গোধূলির ক্লান্ত জলাধারে (সীমাবন্ধ আধারে গতিদ্যোতক 'ভেসে যাচ্ছে' ক্রিয়া অর্থহীন)

নপুংসক যযাতি (যযাতি 'জরাগ্রস্ত' কিন্তু পুত্রবান্ ছিলেন : 'পৌরাণিক অভিধান,' পৃ. ৩৫২। 'নপুংসক' ও 'জরাগ্রস্ত' একার্থবোধক নয়)।

'কাস্তে'র মতো চাঁদ—এ ধরনের চিত্র এবং 'নদী-সমুদ্রে'র বা 'বেহুলা-লখিন্দরে'র রূপক বর্তমান বই তিনটিতে একাধিকবার পেয়েছি। বাংলা কবিতা থেকে এগুলির বিদায় নেবার দিন সমাসন্ন। তেমনি 'জননী আঁধার', 'পিতামহ অন্ধকার' ইত্যাদিও সময় সময় অর্থহীন বোধ হয় ('মাতামহ অন্ধকার', 'পিসীমা আলোক'-ই বা নয় কেন!)। 'অমল' শব্দটি বহু ব্যবহারে মলিন হয়ে পড়েছে। আর অবিলম্বে যাঁকে বাংলা কবিতার রাজ্য থেকে চিরতরে নির্বাসিত করা উচিত, তিনি 'ঈশ্বর' (সময় সময় 'ঈশ্বরী'সহ তিনি বিরাজ করেন, কখনও বা ভাষান্তরে 'আল্লা' হয়ে দেখা দেন)। 'ঈশ্বর' তো বাংলাদেশের কবি নন, তাঁকে কেন 'দল-ভাঙাগড়ার ফল' পেতে হবে!

বাংলাদেশের তরুণ কবিরা ভিন্ন বৃক্ষে ভিন্ন ফুল ফোটাবার সাধু প্রচেষ্টা যতই করুন না কেন, নিজস্ব কাব্যপ্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠ না হলে নিজের কথা নিজের ভাষায় বলতে প্রয়াসী না হলে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের রচনা বিশেষ একটি অন্ধকার উদ্যানের কয়েকটি কণ্ঠস্বরেই পর্যবসিত হবে, যে-স্বর বৃহত্তর সৎ পাঠকগোষ্ঠীর কানে এবং মরমে কখনই পৌঁছতে পারবে না।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সমালোচনা

যত দূরেই যাই—সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাঃ লিমিটেড। মূল্য তিন টাকা।

১৩৪৬ সালে, তেইশ বছর আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই "পদাতিক" বেরিয়েছিল। আজ সে-সব কবিতার প্রেরণা স্তিমিত হলেও, সে-সময়ে, মানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে, বামপন্থী-মহল তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল। 'কমরেড', 'কৃষাণ-মজুর', 'বলশেভিক', 'মিছিল', 'লালপ্রত্যূষ' ছাড়িয়ে সেদিনে সুভাষের চেতনা অন্যপথগামী হয়নি। ফলে তিনি কোনো বিশেষ দলের বিশেষ তারিফ অর্জন করলেও, কাব্যপ্রিয়দের খুশী করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

যে বাস্তববাদকে কাব্যের উপজীব্য হিসেবে সুভাষ সেদিন গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে কবিতা লেখা চলতে পারে না। সাম্যবাদী বিপ্লবের আশায় যতো রোমান্টিকই তিনি হয়ে উঠুন এবং 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?' বলেই যতোই আবেদন পেশ করুন, ভারত সেই বাস্তববাদিতার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এই বাস্তবতা নিয়ে রোমান্টিক না হয়ে, সত্যিকারের রোমান্টিক যদি তিনি হতেন, যার ছোঁওয়া তাঁর মেজাজে ছিল, তাহলে হয়ত আজকের দিনেও "পদাতিক" সার্থক বলে গণ্য হতে পারত। সেদিনে তিনি এমন সুন্দর পংক্তি-ও ত লিখেছেন—

যেখানে আকাশ চিকণ শাখায় চেরা
চলো না উধাও কালেরে সেখানে ডাকি।

অথবা

হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী।

কাজেই আমার বক্তব্য অসমীচীন বলে মনে হয় না।

"পদাতিক" শুরু হয়েছিল বলে : 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য। তেইশ বছর পর "যতো দূরেই যাই" কাব্যগ্রন্থেও তাঁর ফুলের প্রতি সে-অণীহা যায়নি। এখনও তিনি বলছেন—

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনদিনই আমার টান নেই। (পাথরের ফুল)

কিম্বা

ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে। (ঐ)

তবে ইতিমধ্যে ফুলের প্রবেশ হয়েছে যে তাঁর জীবনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই প্রথম কবিতায়ই আছে।—

হাতের মুঠোটা খুললাম।
কালরাত্রের বাসি ফুলগুলো

সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। (যেতে যেতে)
রাত্রিতে অন্তত টাটকা ফুলই তাঁর হাতে ছিল!

"যত দূরেই যাই"-এর কিছু কবিতায় আছে, জার্মান রোমাণ্টিকদের মতো, রোমাণ্টিকতা হতে রূঢ় বাস্তবতায় জাগরণ। তাই 'এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা' তাঁর অনুভূতিতে 'রাক্ষুসী' হয়ে যায় (যেতে যেতে)। 'পোড়াশহরে' এই রোমাণ্টিকতার রূঢ় বাস্তবতায় জাগরণ সবচাইতে বেশি স্পষ্ট—

বাইরে শাড়িতে ঢাকা
দুটো শুভ্র পা—
আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মত।
তার মুখচ্ছবি কেমন
কোনদিনই জানব না।
হঠাৎ
আমার ইচ্ছে হল ছুটে পালিয়ে যেতে।
আমার ইচ্ছে হল যেতে
যেখানে তার চোখের
উজ্জ্বল নীল মণির মত আকাশ।
যেখানে ঢেউ তুলে আমাকে ডেকে নেবে নদী।
যেখানে যাব
আর আসব না।
তারপর ট্রাম থেকে নেমে
ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলাম।
পালাতে পালাতে
পালাতে পালাতে
ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড একটা হা-মুখ
আমাকে ঢেকে নিল।

জীবনের সহজ মর্যাদায় জীবনকে বুঝে নেওয়া হৃদয় দিয়ে—এই মনোভাব সুভাষের কবিতায় উঁকি দিয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে যে তিনি নিঃশেষ হয়ে যান নি। এ ধরনেরই কবিতা, 'যত দূরেই যাই'—

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা গাঁথা
এক নদীর নাম—
আমি যত দূরেই যাই।
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।

এখানে বাংলা ঐতিহ্যের কবি সুভাষ। এর কাছে তাঁর অতীতের এসব প্রারব্ধও আমরা ভুলে থাকতে পারি—

পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায়। (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)।

"যত দূরে যাই"-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, "পদাতিকে"র প্রতিধ্বনি নয়, পদক্ষেপের অন্য ধ্বনি শুনেছি। একে মোড় ফেরা এখনো ঠিক বলা যায় না তবে আশা করা যায় যতো দূরেই তিনি যান, আবেগ-সংবেগ পরিত্যাগ করে হয়তো আর চলতে পারবেন না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মনসিজ—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। অগ্রণী প্রকাশনী। কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

হেন্‌রি জেমস্‌-এর সঙ্গে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনরকম তুলনা চলে এ-ধরনের কোন ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। হেন্‌রি জেমস্‌ আমেরিকান সাহিত্যের অন্যতম ধ্রুপদী লেখক বলে স্বীকৃত। তাঁর মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা, সাংগঠনিক গাঁথুনি অসাধারণ এবং অতুলনীয়। তাঁর রচনা-রীতি ভারী; ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে না পড়লে প্রতি ছত্রে তিনি যে বিভিন্ন চরিত্রের মানস-পটের উপর নতুন নতুন আলোক-সম্পাত করছেন তা ধরা পড়ে না।

আমি হেন্‌রি জেম্‌সের নাম উল্লেখ করছি শুধু এই জন্য যে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা-রীতির সঙ্গে জেমসের রীতির খানিকটা বাহ্যিক মিল আছে। খুব সম্ভব এ মিল সচেতন অনুকরণ প্রয়াস জাত নয়। লেখকের শিল্পী প্রকৃতিই তাঁকে এই ধ্রুপদী রীতির দিকে টেনে নিয়েছে। তাঁর লেখার স্টাইলও ভারী, ধীরে ধীরে না পড়লে এ জিনিসের রস উপভোগ করা সম্ভব নয়। আধুনিক উপন্যাসে যে ত্বরিৎগতি ঘটনা প্রবাহের বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় তা অনুপস্থিত। নিতান্ত তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যবহার করে তিনি তাঁর চরিত্রদের মানস-লোক বিশ্লেষণে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। তিনি যখন একটি সংলাপ লিপিবদ্ধ করেন, তখন প্রতিটি চরিত্রের প্রতিটি উক্তির পিছনে যে চরিত্রগত অভীপ্সা কাজ করছে, মনের গভীরে যে-চিন্তা পারম্পর্যের খেলা চলছে, তিনি তার বিস্তৃত বিবরণ দেবেন। হেন্‌রি জেমসের পদ্ধতিও অনুরূপ। এই পদ্ধতির অসুবিধা সহজেই অনুমেয়। বিশ্লেষণের বাহুল্যে ঘটনা ও সংলাপ গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে বলে পাঠকের মনোযোগ অব্যাহত রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। পাঠককে আকৃষ্ট করার সহজ পন্থা ত্যাগ করে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ধ্রুপদী রীতি গ্রহণ করে তাকে জীবনের গভীরে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মনোবিশ্লেষণ নানা জাতের আছে। সচেতন মনকে যে অবচেতন মন মানুষের অজ্ঞাতসারে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে উদ্‌ঘাটন করেছেন ডি. এইচ. লরেন্স প্রভৃতি লেখক, বা আমাদের দেশের মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার আর এক জাতের মনোবিশ্লেষণ মূলতঃ মানুষের সচেতন মন নিয়েই কারবার করে। মানুষের অভীপ্সা, মূল্য ও নীতি-বোধ

এবং বিবেকের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে, যার ফলে মানুষের চরিত্র এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে সঞ্চরণশীল হয়, লেখক তাই উদ্‌ঘাটন করেন। হেন্‌রী জেমসের মধ্যে এই স্থিতীয় পদ্ধতির সাক্ষাৎ মেলে। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যেও। কিন্তু তাঁর প্রয়াস এখনো অসম্পূর্ণ, অপরিণত; আর সেই জন্যই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে ক্রম-পরিণতির অভাব। তারা প্রায় একই বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকে। "মনসিজ" লেখকের "অন্তর্মনা" বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়। কিন্তু "অন্তর্মনা'য় লেখকের যে সুবিধে ছিল, "মনসিজে" তা নেই। "অন্তর্মনা'য় একটি অপরিণত অথচ সংবেদনশীল কিশোরের চোখ দিয়ে লেখক একটি দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারের নাটকীয়তা ও জটিলতাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঘটনার তীব্রতা ও রূঢ়তা কিশোর মনকে যন্ত্রণা-জর্জর করেছে, কিন্তু ঘটনার পিছনের কার্য-কারণ সূত্র সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। এই আলো-আঁধারির খেলাই বইখানিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কিন্তু "মনসিজে" এই তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ নেই। নায়ক এখানে পরিণত বয়স্ক যুবক। ঘটনার পিছনের কার্যকারণ-সূত্র সে বোঝে; এবং যেহেতু সে লেখকের প্রতিনিধি, সে বিভিন্ন চরিত্রের অভীপ্সা ও কার্য বিশ্লেষণে সুনিপুণ। কাজেই পূর্ববর্তী গ্রন্থের সুবিধা এ বইয়ে যেমন নেই, তেমনি একটি নতুন অসুবিধে দেখা দিয়েছে। এ বইয়ের প্রায় সমস্ত চরিত্রই অত্যন্ত পরিচিত। নানান্ জায়গায় নানান্‌ভাবে এই সব মধ্যবিত্ত চরিত্রের সঙ্গে আমাদের বারবার দেখা হয়েছে। এদের মধ্যে তাই নতুন কিছু আবিষ্কার করে দেখানো সহজ নয়। বিশেষ করে লেখক অন্ততঃ এ বইয়ের সীমার মধ্যে ক্রম পরিবর্তনশীল চরিত্রাঙ্কনের দিকে নজর না দিয়ে সুনির্দিষ্ট টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বলে তাঁর অসুবিধে আরও বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন চরিত্রকেই নতুন বলে মনে হয় না, বা পুরোণোকে নতুন করে দেখছি বলে মনে হয় না। বিধবা মা যিনি সন্তান স্নেহের শরীরী প্রকাশ মাত্র; ছোড়দি যে আরাম এবং বিলাস যথেষ্ট ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার পাত্রদের খাতিরে যে যে-কোন ত্যাগ-স্বীকারেই প্রস্তুত; অতীশদা, যিনি আপন-ভোলা রাজনীতি-করা লোক। চাকরির টাকা দিয়ে নিঃসম্পর্কিত এক পরিবারকে সাহায্য করেন; বড় লোকের মেয়ে স্মৃতি যে প্রেমে পড়েও খামখেয়াল অহংকারকে ছাড়তে পারে না;—এঁরা সবাই আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। লেখকের পদ্ধতি বাস্তবধর্মী হলেও, প্রকৃতিতে তিনি রোমাণ্টিক বলে তাঁর সব-চরিত্রই আদর্শীকৃত। তার ফলে একাধিক ভার সংযোজন করে চরিত্রগুলো জটিলতর করে তুলতে চেষ্টা করেননি লেখক। অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই বলে চরিত্রগুলোর কোন নিজস্ব গতি নেই। বেগ নেই। কাজেই চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখক কোন অভিনবত্ব বা মৌলিকত্ব দেখাতে পারেন নি।

আগেই বলেছি, লেখকের কাহিনীর অংশ খুব নগণ্য। দৃশ্যগুলো প্রায় সবই গতানুগতিক দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনা-মাত্র। কাজেই তার মধ্যেও বিস্মিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। অথচ এই পরিচিত ও অকিঞ্চিৎকর উপাদান নিয়ে লেখক যে অতীশদা ও ছোড়াদির প্রেম-কাহিনী এঁকেছেন তার আড়ম্বর-বর্জিত রূপটি উপভোগ্য। এই প্রেমের প্রকাশে কোন গদগদ ভাষা নেই। কোন আবেগ-কম্পিত প্রতিশ্রুতি নেই। নিতান্ত সহজ হাসি-ঠাট্টা, দায়িত্ব গ্রহণ ও ত্যাগ-স্বীকারের ভিতর দিয়ে তা এক অনায়াস সার্থকতায় উন্নীত হয়েছে। জীবনের অনিশ্চিতের দরুণ আকাঙ্ক্ষিত মিলন সম্ভব হচ্ছে না; কিন্তু অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় কোন ক্লান্তি নেই। এই চিত্রও আদর্শীকৃত; কিন্তু জীবনের সমস্ত অপ্রাপ্ত

আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে যে প্রেম ক্ষতিপূরণ করতে সমর্থ লেখক এই জোরালো বক্তব্যকে হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন।

বইয়ের প্রধান চরিত্র, অনিন্দ্য, যার চোখ দিয়ে লেখক সব-কিছু দেখছেন, সে নিজে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট থেকে গিয়েছে। স্মৃতির সঙ্গে তাঁর প্রেমও গতানুগতিক। স্মৃতির মধ্যে রয়েছে বড়লোক সুলভ অহংকার; অনিন্দ্যর মধ্যে রয়েছে বিত্তবানদের সম্পর্কে অর্জিত সংস্কার। এই অহংকার এবং সংস্কারের মামুলী দ্বন্দ্ব থেকে লেখক এদের প্রেমকে মুক্ত করতে পারেননি।

কাজেই সমগ্রভাবে লেখক এ বইয়ে সীমাবদ্ধ সার্থকতা অর্জন করেছেন এ-কথা বলাই সঙ্গত। আগেই বলেছি সামগ্রিক ফলশ্রুতি যাই-হোক, লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক রস লুকিয়ে আছে যা শুধু ধৈর্যশীল পাঠকদের কাছেই লভ্য। ছোট ছোট কথার মধ্যে লেখকের কল্পনা-কুশলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বিবাহিতা বসুন্ধরা এসেছে ছোড়দির কাছে সেজেগুজে। তাকে দেখে অনিন্দ্য ভাবছে, 'বসুন্ধরা জানাতে চায় এমন একটা জীবনের স্বাদ সে পেয়েছে যার থেকে ও (ছোড়দি) বঞ্চিত। তবু মনে হল এই জীবনের স্বাদ পেলে ছোড়দির যা পরিবর্তন আসতে পারে তা সে এখুনি একবার কল্পনা করে নিতে পারে।' আবার একটু পরে—'বসুন্ধরার অবয়বের মধ্যে স্মৃতিরেখাকে যেন দেখতে ইচ্ছে করল। তাই বসুন্ধরার শরীরটাকে স্মৃতির শরীর ভেবে কল্পনায় কিছু একটা গড়ার চেষ্টা করল।'

স্মৃতির সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ার পর তাকে যখন অনিন্দ্য ট্রামে তুলে দিল এবং ট্রাম চলতে সুরু করল তখন ছেলেবেলার একখানা ছবির বইয়ের কথাই মনে আসছিল। একটা অন্ধকার টানেল আর তার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে একখানা ইঞ্জিন।

এই রম্যরচনার যুগে, লেখক নিঃসন্দেহে পাঠক-সমাজের মনোযোগ দাবী করেন।

অচ্যুত গোস্বামী

God was Born in Exile. *By* Vintila Horia. Translated by A. Lytton Sells. George Allen & Unwin Ltd. London. 16*s*.

দুর্নিরীক্ষ্য অতীতের প্রতি নির্মোহ হওয়া সহজ নয়। যা বর্তমানে অনুপস্থিত, কালের সুদীর্ঘ সেতু পার হয়ে যার পাশে পৌঁছন যাবে না, অথচ ইতিহাসে উপকথায় সাহিত্যে যার মুখের রেখা অস্পষ্ট হলেও মুছে যায় নি, তার প্রতি নির্মোহ হওয়া কঠিন। সময়ের ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকার পর্দার ওপারের সেই দূরের প্রতি বরং আমাদের পক্ষপাতিত্ব, তীব্র আগ্রহ। যদি কোন লেখক পিছনের দীর্ঘ পথের অন্ধকার সরিয়ে বর্তমানের আলোয় সেই দুর্লক্ষ্য অতীতের মুখ উদ্ভাসিত করতে পারেন, যদি সেই দূরের সঙ্গে একালে আমাদের একাত্মীকরণের অন্তত কয়েকটি সূত্র মেলে, তাহলে আমাদের তীব্র আগ্রহের সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময় মিশে যায়। এই বিষয়টি কিছু নতুন অথবা দুর্জ্ঞেয় নয়। চিরকাল শিল্পীরা এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। তবে কিছুকাল থেকে এদেশের এবং ইয়োরোপীয় অনেক ঔপন্যাসিক বিষয়টি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তার ফলে তাঁদের সুদূর অতীতাশ্রয়ী

উপন্যাসগুলি তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির স্বীকৃতি পেয়েছে। এই লেখকরা অতীতাশ্রয়ী হলেও তাঁদের সমসময়চেতনার তীক্ষ্ণতায় কমতি নেই। তার প্রধান কারণ দুঃসহ আত্মিক যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত কিছু মৌল প্রশ্ন সমকালীনতানিরপেক্ষ। অস্তিত্ব ও লুপ্ত অস্তিত্বের এই সব দুঃসহ যন্ত্রণার অনুভব ও বেদনার্ত প্রশ্ন চিরকাল সমকালীন; এখানে অতীত ও বর্তমান এবং আধুনিক ও অনাধুনিকের কথা ওঠে না। বস্তুত এই মূলগত সাদৃশ্য আছে বলেই ইতিহাস, উপকথা ও সাহিত্যবিধৃত কয়েক হাজার বছর আগের চরিত্রের সঙ্গেও একালে আমাদের সমীকরণ সম্ভব।

ভিণ্টিলা হোরিয়া নিজের জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দু হাজার বছর আগেকার একটি চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যের সূত্র খুঁজে পেয়ে আলোচ্য উপন্যাসটি রচনা করেছেন। প্রায় দু'হাজার বছর আগের সেই চরিত্র পাবলিয়াস ওভিডাস নাসো। ওভিড খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোমের অসংযত বিত্তবানদের প্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর নিজের ঘোষণা অনুসারে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত প্রেমের উপাখ্যানের সংকলন *Amores* (প্রেম) তাঁকে প্রথম কবিখ্যাতি দিয়েছিল। পেনিলোপ, ডিডোর মত সুবিদিত মহিলাদের অনুপস্থিত প্রেমিকের প্রতি লিখিত কল্পিত পত্রের সংকলন *Heroides* (নায়িকা) এবং তাঁর *Ars Amatoria* (প্রেমের প্রকরণ) তাঁর কবিখ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। *Fasti*-তে রোমের বিভিন্ন উৎসবের অসম্পূর্ণ বর্ণনা এবং *Metamorphoses*-এ অজস্র উপকথা ও অতিকথার কাব্যিক বিবরণ দেওয়ার আগেই তিনি সে-কালের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। পরিণত বয়সে রচিত *Tristia*-য় (দুঃখ) এবং *Epistulae ex Ponto*-তে (কৃষ্ণসাগর থেকে লেখা চিঠি) ওভিডের নিজের জীবনের অনেক তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে *Tristia*-র প্রথমাংশে বর্ণিত রোমে তাঁর শেষ রাত্রির অভিজ্ঞতা তীব্র যন্ত্রণার আঘাতে কম্পিত। ওভিডের এই সব কাব্য পাঠে অবশ্যই তাঁর মননের ক্রম-উত্তরণের একটি আদল পাওয়া যায়। মনে হয়, সমগ্র মধ্যযুগে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং রেনেসাঁসের কবি-শিল্পীদের ওপর তাঁর স্পষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও, কোন গভীর অনুভব তাঁর মনে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি এবং অন্তত একালের অর্থে তাঁর নৈতিক শৈথিল্য ও তারল্য ছিল। ভার্জিলের মত ভাবগম্ভীর তিনি কখনও হতে পারেন নি, তাঁর ক্ষমতার পরিধি কখনও মহাকাব্যের নাগাল পায় নি।

খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোমের অসংযত ইন্দ্রিয়গতপ্রাণ বিত্তবানদের প্রিয় কবি ওভিডের বিষয়ে এই সব কথা মনে রেখে ভিণ্টিলা হোরিয়ার বইটি পড়তে শুরু করলে পাঠক অত্যন্ত বিস্মিত হবেন। কারণ হোরিয়ার উপন্যাসে অন্য এক ওভিডের মূর্তি ক্রমান্বয়ে অনিবার্য রূপ নেবে। প্রথম শতকের প্রথম দশকে সম্রাট অগস্টাসের এক আদেশে ওভিডের অভ্যস্ত জীবনে বিপর্যয় আসে। 'একটি কবিতা ও একটি ভুলের' জন্য অগস্টাস তাঁকে ইটালী থেকে নির্বাসিত করেন। তাঁর 'একটি কবিতা' অবশ্যই *Ars Amatoria*, কিন্তু তাঁর 'একটি ভুলের' ব্যাখ্যা আজও নিশ্চিতরূপে মেলেনি। কৃষ্ণসাগরের তীরে রোমান সৈন্যাবাস ঘিরে গড়ে ওঠা ছোট শহর টোমিসে ওভিডের নির্বাসিত জীবন কাটে। এখানেই সতের সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বইটি ওভিডের নির্বাসিত জীবনের স্বরচিত স্মৃতিকথা নয়। ভিণ্টিলা হোরিয়ার এই উপন্যাস ওভিডের কল্পিত স্মৃতিকথা। বইটির মূল আখ্যানবস্তু নির্বাসন। গত বিশ্বযুদ্ধের পর ভিণ্টিলা হোরিয়া তাঁর নিজের দেশ কমিউনিস্ট রুমানিয়া থেকে দূরে ইটালী ও

স্পেনে স্বেচ্ছায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করেন। নির্বাসন মন ভেঙে দেয়, আবার মনকে গ্লানিমুক্ত ও বিশুদ্ধ করার অসাধারণ শক্তি আছে নির্বাসনের। নিটশে বলেছিলেন, 'সত্য উদ্ঘাটনের শক্তি লাভের জন্য আমি নির্বাসন বেছে নিয়েছিলাম।' ১৯৫৮ সালে ওভিডের দ্বিসহস্রতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ওভিডের কাব্যে নতুন করে মগ্ন হয়ে নির্বাসিত ভিণ্টিলা হোরিয়া উপলব্ধি করেন, আত্মিক যন্ত্রণার অনুভবে তিনি ও ওভিড অভিন্নহৃদয়। কৃষ্ণসাগরের তীরে ডেসিয়ানদের দেশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ক্ষুদ্র টোমিস শহরে নির্বাসিত অন্য এক ওভিডের, অস্তিত্ব ও লুপ্ত অস্তিত্বের অজস্র মৌল প্রশ্নের ভারে ক্লান্ত অন্য এক ওভিডের মূর্তি তাঁর চোখে ধরা দেয়। যখন তাঁর মনে হয়, তাঁর ও ওভিডের একাত্মীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, হোরিয়া ওভিডের এই কল্পিত জর্নল লিখতে শুরু করেন।

বইটির আটটি পরিচ্ছেদ ওভিডের নির্বাসনের আট বছরের জর্নল। প্রথম বছরে ওভিড রোমানদের ঈশ্বরদের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে ভয়ঙ্কর শূন্যতার সম্মুখীন। তারপর এক-একটি বছরে নতুন পরিচয়ে, নতুন প্রেমে, নতুন এক ঈশ্বরের সম্ভাবনার পথে হৃদয়ের সব প্রার্থনা বিছিয়ে দিয়ে তিনি সেই ভয়ঙ্কর শূন্যতার আঘাত প্রতিরোধ করেছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় অনাহারে উন্মাদ ডেসিয়ানদের দ্বারা টোমিস শহর অবরোধের নিখুঁত বর্ণনা আছে, সাম্রাজ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ রোমান সৈন্যদের শিবির ত্যাগ করে ডেসিয়ায় পলায়নের বিস্ময়কর কাহিনী আছে। কিন্তু এসবই প্রায় বহিরঙ্গের বিষয়। বইটির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে ওভিডের আত্মার ক্রম-উত্তরণের ইতিহাস। ভিণ্টিলা হোরিয়ার উপন্যাস নির্বাসনের শুরু থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওভিডের ভয়ঙ্কর শূন্যতাবোধ, দুঃসহ একাকীত্ব, অতীত জীবনের অজস্র স্মৃতির ভার, রোমান ঈশ্বরদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস থেকে এক নিগূঢ় উপলব্ধিতে উত্তরণের জর্নলধর্মী খতিয়ান।

বইটির প্রথমাংশে পাঠককে টানবার অনেক উপকরণ আছে, কিন্তু মাঝখানে অনেকগুলো পাতা অতিক্রম করা রীতিমত ক্লান্তিকর। অবশ্য সারমাটিয়ানদের আক্রমণ, ওভিডের ডেসিয়া পরিক্রমা এবং গ্রীক চিকিৎসক থিয়োডোরের মুখে বেথলহেমের আস্তাবলে মেরির পুত্রের জন্মের বিবরণের সময় পর্যন্ত বইটি আবার পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। বইটির শেষের দিকে মানুষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সম্ভাবনার তীব্র আঘাতে কম্পিত এক ক্ষণকাল নানাবর্ণে চিহ্নিত : If someone discovers this journal, he will be able to share in the torments and hopes of the unique age in which we are living : the age of expectation and certainty. It is only a moment in time, I know that, but it is one of the finest in the history of men, for God is now among us and He has not yet revealed His presence.

ওভিডের আট বছরের নির্বাসনের স্মৃতিকথা সংগত কারণেই একটি নিটোল গল্প নয়। তবে ওভিড কয়েকটি নিটোল ছোটগল্পের সাক্ষী এবং সেগুলিকে লেখক আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন ডোকিয়া ও অনরিয়াসের কাহিনী, লিডিয়া ও হেরিমনের কাহিনী। এই সব ছোটগল্পের বৃত্ত এমন নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ না করে, দু'টি করে সরলরেখার অনির্দিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখলে গ্রন্থখানার বেশি সংযমের পরিচয় দিতেন। এই সংযমের অভাবে দু'হাজার বছর আগে লেখা ওভিডের কল্পিত জর্নলের সঙ্গে একালের প্রচলিত উপন্যাসের প্রকরণগত মিল অবাঞ্ছিতভাবে এসেছে।

অগস্টাস ও টাইবেরিয়াসের সাম্রাজ্যে গ্লানিকীর্ণ দিনযাপনের একটি স্পষ্ট আদল

বইটিতে পাওয়া যায়। অবশ্য হাওয়ার্ড ফাস্টের *Spartacus*-এ প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটির যে ঘনিষ্ঠ বর্ণনা আছে এখানে তা অনুপস্থিত। তবে মনে রাখতে হবে, *Spartacus*-এর মত *God was Born in Exile* ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। তাছাড়া ভিণ্টেলা হোরিয়া অনেক বেশি প্রতীকনির্ভর : Not to think in symbols, not to seek a meaning in everything that takes place before our eyes, not to transform signs which carry on reflection of the present into images of what will one day come about, not to mix the gods and the stories we have invented about them with everyday happenings—but how can we prevent ourselves from doing this? Our whole education tends toward a symbolism in which we strive, in our morbid vocation for the inevitable and the tragic, to discover the face of our own future.

গ্রন্থকার আরও একটু মিতবাক হলে তাঁর যন্ত্রণার অনুভব এবং বক্তব্য হয়ত আরও তীক্ষ্ণমুখ হত। জর্নলধর্মী সাহিত্যকর্মে প্রাচীন পৃথিবীর ঐতিহাসিক ও বিশেষতঃ ভৌগোলিক বিষয়ের নিখাদ তন্ময় বিবরণ নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণতা কমায়।

ভিণ্টেলা হোরিয়ার উপন্যাসে অনেক বিচিত্র সুন্দর প্রাচীনগন্ধী উপমা আছে। তাছাড়া ওভিডের সমকালের করলণ কয়েকটি প্রতীক অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদ করে। অথচ এর মধ্যে দু'একটি উপমা নিঃসন্দেহে বেমানান এবং প্রায় কিশোরোচিত। যেমন : We love each other, and this makes me think of two flowers growing on separate trees. They would fain be together, but only their wordless hues and distant scents can touch, amid all the stupidity and indifference of the world. লেখক এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন যাদের অনুষঙ্গ খৃস্টধর্মের হৃদয় থেকে উৎসারিত। ওভিডের নির্বাসনকালে, যখন যীশুর জন্মের সংবাদ মাত্র কোন কোন মহলে পৌঁচেছে, সেই সব শব্দের সেই অনুষঙ্গে ব্যবহার সংগত মনে হয় না। অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার যে মূল উপন্যাসটি ফরাসী ভাষায় লিখিত এবং আমরা তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ছি।

সুধাংশু ঘোষ

এই দশকের গল্প—বিমল কর সম্পাদিত। পলাশী। কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।
মালঞ্চের রঙ—বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সম্বোধি পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা ১। মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ ন. প।

শিল্পে এবং সাহিত্যে নানা পরীক্ষা অনিবার্য। শিল্পী এবং সাহিত্যিক যেহেতু সামাজিক জীব, সেই কারণেই আশা করা সংগত, সমাজের ভাঙা-গড়া তাদের মনে নতুন বোধের সৃষ্টি করবে। নতুন মূল্য প্রতিষ্ঠায় তাঁরা উৎসাহিত বোধ করবেন। কোনো লেখকের মধ্যে এ প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি স্বভাবতই শঙ্কার কারণ। যদিও অনস্বীকার্য, সাহিত্যকর্ম কোনো বিশেষ অভিধা আশ্রয়ী নয়। তবু এমন রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তত্ত্ব এবং বস্তুনিষ্ঠার সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত মানুষের ভাবনা ঘটনার সমান্তরাল। শিল্পীর চেতনায় তার

উত্তরণ। সে কারণেই কোনো লেখকের মানসিকতা নৈতিমূলক হওয়া অবাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস, যার ছায়া আশ্রয়ে আমাদের মন রসপরিপুষ্ট, ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে এই দশকের যাঁরা লেখক তাঁদের কাছে পুরাণো মূল্যগুলি কয়েকটি বিমূর্ত সংজ্ঞার মত উপস্থিত। অনুপ্রেরণার বাস্তবিক উৎস নয়। জীবন এঁদের কাছে অপেক্ষাকৃত জটিল। মন এঁদের কদর্য অবময়ে অবসিত। তাই নতুন লেখকের দায়িত্ব অনেক বেশী। অন্ধকারের অরণ্যে তাঁরা ক্ষীণ হলেও আলোর সংকেত করবেন, একি সত্যি দুরাশা?

নানা কারণেই এই দশকের গল্প একটি উল্লেখ্য সংকলন। যাঁদের লেখা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তাঁরা সকলেই বিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যবর্তী। সংকলনের সম্পাদক ভূমিকায় বলেছেন, বয়সে, অন্তর্ভুক্ত লেখকবৃন্দ সকলই তরুণ। এবং দু'একজন বাদে সকলেরই সাহিত্যচর্চা স্বল্পকালের। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষা-নবিশী-পর্ব অতিক্রম করে নিজস্ব পথটি খুঁজে পেয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত সংকলকের এই শেষ বক্তব্যের সঙ্গে আমি দ্বিমত। এই সকল লেখক, তাঁদের রচনার বিচ্ছিন্নভাবে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কেউ কেউ বর্ণনায় অনন্য ক্ষমতার অধিকারী, কারও বস্তুনিষ্ঠা বিস্ময় সঞ্চারী, এবং কারো পর্যবেক্ষণ দ্বিধাহীন প্রশংসার পরিচিতি। এত কিছু সত্ত্বেও কখনও মনে হয় না, এদের সামনে কোনো পথ আছে। কোনো বিশেষ পথের এঁরা যাত্রী। অথবা কোনো নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এঁরা অবতীর্ণ। অবশ্য রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর' এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। তাঁর লেখার প্রেক্ষিত এক অনাবশ্যক অবতরণিকা নয়। তাঁর বক্তব্য প্রত্যক্ষ।

একটি মৌল বিষয়ের প্রতি এই লেখকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা বোধকরি সংগত। প্রকৃত সৃজনশীল শিল্পীর পক্ষে সকল অর্থে শূন্যবাদী হওয়া অসম্ভব। শিল্পীরও সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা লাইবনিৎসের মত মনকে অলিখিত শ্লেটের সঙ্গে তুলনা করে সে ছবির অবিকল প্রতিশব্দ উচ্চারণ করেন, তবে স্বতই সংশয় সম্ভব। ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁদের মনের বিবর জীবন বিবর্তনের আপাত ছাপ নিয়েই স্তব্ধ। তার জটিলতার বিন্দুতে পৌঁছুতে একান্ত অক্ষম!

"এই দশকের গল্প" গ্রন্থে সংযোজিত প্রত্যেকটি গল্প অপ্রত্যাশিত উদ্ভাসেই নিঃশেষিত। সেই গভীর হতে গভীরতর যামে যেন এদের সঞ্চারণ সম্ভব হয়নি। গল্পগুলি পড়ার পর কেমন যেন মনে এক অতৃপ্ত আস্বাদ। এঁদের অনেকেই আর সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নেই। অথচ বহু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, এঁদের মননে শৈশব এখনও উপস্থিত। সম-সাময়িক কালে মতি নন্দী, দেবেশ রায় এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমধিক উল্লেখযোগ্য। এঁদের সাহিত্য চর্চা বহুদিনের। তা সত্ত্বেও এঁদের লেখা যেন কেমন বিশ্লিষ্ট। অবশ্য উল্লিখিত তিনজন লেখক সমগোত্রীয় নন। মেজাজের দিক থেকেও তাঁরা ভিন্ন। মতি নন্দীর বস্তুনিষ্ঠায় আশ্চর্য অধিকার। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক। দেবেশ রায় তত্ত্বাশ্রয়ী। ফলে ঘইনার প্রকৃত চরিত্র তাঁর মনের রঙে ভিন্ন পরিবেশ নির্ভর। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনায় রঙ লাগাতে ব্যস্ত। কিন্তু কারো পক্ষেই পরিণত লেখকে উত্তরণ সম্ভব হয়নি। কেবলই মনে হয়েছে, এক অপরিচ্ছন্ন অবহেলায় অনেক অঙ্কুর লতা বৃক্ষে পরিণত হতে পারল না। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজে ও প্রকাশে এত বেশী সুরেল, যে মাঝে মাঝে তা' অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হয়। ধারণা হয়, গদ্য রচনার মূল সূত্রটি তাঁর কাছে অবহেলিত।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর লেখা মূল্যাশ্রয়ী। কিন্তু তাঁর অসংযত আবেগ, অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার পথরোধ করেছে। প্রবোধবন্ধু অধিকারী এবং দিব্যেন্দু পালিত চতুর ঘটনাশ্রয়ী। তাঁদের লেখায় ঘটনার প্রাধান্য অনেক সময় শিল্পবোধের পরিপন্থী। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা এই তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকদিক থেকে প্রশংসনীয়। প্রধানত তিনি অনুভূতি প্রবণ। তাঁর স্নায়ুর জগতে বিচিত্র সব তত্ত্ব বর্তমান। অথচ তাঁর লেখা তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না। তাঁর তত্ত্বগুলি লেখা থেকে স্বতোৎসারিত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঘটনার বিন্যাসে বিস্ময় জাগায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-বেদনা, যন্ত্রণা এবং নৈরাজ্য এঁর অনায়াস আয়ত্তে। আর এই মাটির সংসারকে অতি নিপুণ রেখায় তিনি আঁকতে সক্ষম।

এছাড়া যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অজয় দাশগুপ্ত বিভিন্ন অর্থে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কারণ, দু-একজন ছাড়া আর কাউকেই আমার যত্নশীল মনে হয়নি। বোধ করি স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সেই অশিক্ষিত পটুত্বের এখন অন্তিম কাল। লেখক শুধু সৃজনশীল শিল্পীই নন। বস্তুত বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক কারুশিল্পীও। সংকলনটি পাঠের আগে, আশা করেছিলাম এক নতুন পরীক্ষার সন্ধান পাব। কিন্তু তা পূরণ হয়নি।

প্রসঙ্গত সম্পাদকের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। সঙ্কলনের জন্য গল্প নির্বাচনের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করলেই বোধ করি ভাল হত। কারণ এমন একটি গ্রন্থ সম্পাদনার পিছনে যে উদ্দেশ্য, তা উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই সফল হতে পারত। এমন লেখক বিরল দৃষ্টান্ত, যিনি নিজের গল্পের সার্থক বিচারক। লেখকদের ওপর নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে, তিনি যেন তার কর্তব্য অনেকখানি এড়িয়ে গেছেন।

"এই দশকের গল্প" গ্রন্থের লেখকগণের উপকরণ স্বাশ্রয়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁদের শৈশব পরিপুষ্ট। ফলে যা' তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছে এক বিরাট যন্ত্রণার ক্ষত হিসেবে প্রতিভাত, তাঁরা তাকে সমাজের এক অস্বাভাবিক প্রকরণ বলেই গ্রহণ করেছিল। উত্তর তিরিশের লেখকদের সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মালঞ্চের রঙ"।

গ্রন্থে সংগৃহীত সমস্ত গল্পগুলিই এক কালে বাংলা পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সেই দিক থেকে এই গ্রন্থটি মূল্যবান। কারণ এক সঙ্গে এতগুলি সার্থক গল্প পড়তে পারা সৌভাগ্যের বিষয়।

কিন্তু সঙ্কলনের অন্যতম উদ্দেশ্য, এক বিশেষ যুগের মানসিকতার উপস্থাপনা—এই ক্ষেত্রে পালিত হয়নি। মনে হওয়া স্বাভাবিক, বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কাহিনী-লোভী দলকে খুশী করার জন্যই এই গ্রন্থের সঙ্কলন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কাহিনীলোভীর দল কি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মঙ্গলগ্রহ', অথবা সন্তোষকুমার ঘোষের 'হায়না' কিংবা বিমল করের 'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু' পড়ে তৃপ্ত হবেন?

গ্রন্থে সন্নিবেশিত অন্যান্য গল্প, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু,' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কা তব কান্তা', বনফুলের 'আইনের বাইরে', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ল্যাভেণ্ডার' সম্পাদকের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলেই প্রতীত হয়। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সুবোধ ঘোষের 'স্বস্তায়ন' এক বিশেষ মূল্যের অধিকারী।

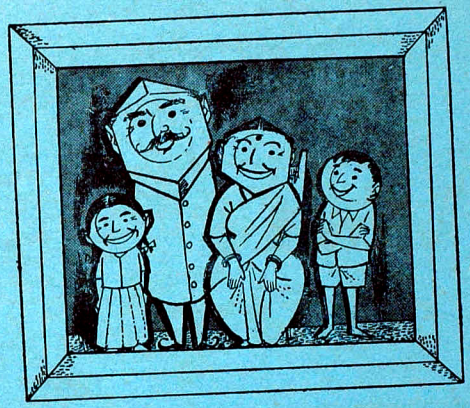

নৃপেন্দ্র সান্যাল

A matter of

FAMILY PRIDE

Metric weights are a well-knit family,
of which the KILO is the head.
Don't equate or compare them to another
family, especially the old seer and viss.
Recognize their intrinsic merit and
employ them as they are; otherwise,
the Kilo family get sulky and cause
delay. Naturally, each family has its pride!

FOR QUICK SERVICE AND FAIR DEALING

USE METRIC UNITS IN ROUND FIGURES